আগস্ট ২০২০

# নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৩১তম সংখ্যা

জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা

## ধন্য সেই পুরুষ

# নিরীক্ষা

২৩১তম সংখ্যা : আগস্ট ২০২০ (বিশেষ সংখ্যা)

শোকাবহ ১৫ আগস্ট। বাঙালি জাতির শোকের দিন। ইতিহাসের কালদিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরের আলো ফোটার আগেই ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে ঐতিহাসিক বাড়িটিতে ঘাতকরা নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়। এ দিন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছিল ক্ষমতালোভী নরপিশাচ কুচক্রী মহল। বাঙালির মুক্তির মহানায়ক স্বাধীনতাসংগ্রাম শেষে যখন ক্ষতবিক্ষত ধ্বংসপ্রায় দেশটির পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন, তখনই ঘটানো হয় ইতিহাসের এই নির্মম হত্যাকাণ্ড। সেদিন ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা, বঙ্গবন্ধুর ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও ১০ বছরের শিশু শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল। এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পাননি বঙ্গবন্ধুর অনুজ শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর ছেলে আরিফ ও মেয়ে বেবী, সুকান্ত বাবু, বঙ্গবন্ধুর ভাগনে যুবনেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শেখ ফজলুল হক মনি, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি এবং আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ কয়েকজন নিকটাত্মীয়। বঙ্গবন্ধুর জীবন বাঁচাতে গিয়ে ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁর সামরিক সচিব জামিল উদ্দিন আহমেদসহ কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এ সময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে রক্ষা পান।

স্বাধীন দেশে কোনো বাঙালি তাঁর নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে না– এমন দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বঙ্গবন্ধুর। সেজন্যই তিনি রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবনের পরিবর্তে থাকতেন তাঁর প্রিয় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর নিজ বাসভবনে। বাঙালির স্বাধিকার-স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার এ বাড়িটি অসম্ভব প্রিয় ছিল বঙ্গবন্ধুর। এখান থেকেই বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে সর্বশক্তি নিয়ে ব্রতী হয়েছিলেন। সেদিন ঘাতকদের স্টেনগানের মুখেও বঙ্গবন্ধু ছিলেন অকুতোভয়। প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোরা কী চাস? কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে?' বঙ্গবন্ধুর সরলতা ছিল– সবাইকে সমান বিশ্বাস করতেন। মানুষের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর। প্রত্যেকের শক্তি-দুর্বলতা সহজেই ধরে ফেলতে পারতেন। মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে বহু দেশি-বিদেশি মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন তিনি। যারা দেশের জন্য কাজ করেছেন, দলের জন্য কাজ করেছেন, যে যেটুকু করেছেন, তার জন্য সম্মান দিতে, স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না বঙ্গবন্ধু। তিনি মনে করতেন, কোনো বাঙালি তাঁকে হত্যা করতে পারে না। এমন ধারণার মূলে ছিল মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর সেই বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছিল।

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সপরিবারে হত্যার পর দীর্ঘদিন বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশ ছিল তিমিরাচ্ছন্ন। ক্ষমতা দখল করে স্বাধীনতার শত্রু সেই পুরোনো শকুনরা। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্ধনে আশ্রয়-প্রশ্রয় পায় বঙ্গবন্ধুর খুনিরা। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের বিচারের পথ রুদ্ধ করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক বিচারের হাত থেকে খুনিদের রক্ষা করতে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে ইনডেমনিটিকে আইন হিসেবে অনুমোদন দেয়।

১৫ আগস্ট মর্মান্তিক ঘটনার মাধ্যমে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এদেশে মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে। ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘোরানোর চেষ্টা চলেছে বারবার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের এই শত্রুরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে কার্যত এ দেশের স্বাধীনতাকেই হত্যা করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ সে ষড়যন্ত্র সফল হতে দেয়নি। ১৯৯৬ সালে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল হয় দেশবাসীর প্রত্যাশার পরিপূরক হিসেবে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও খুনিদের কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক খুনিদের বিদেশ থেকে আইনি পথে দেশে এনে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এ কথা সত্য– বঙ্গবন্ধুর খুনিদের শেষরক্ষা হয়নি। তাদের অপরাধের বিচার হয়েছে– তারা সফল হয়নি। বঙ্গবন্ধু আজ নেই; কিন্তু তাঁর আদর্শ টিকে আছে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে।

প্রতিবছর দিনটি আসে বাঙালির শোক আর বেদনার দীর্ঘশ্বাস হয়ে। পুরো জাতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানকে স্মরণ করে। এ বছর করোনাভাইরাস মহামারি পরিস্থিতিতেও জাতীয় শোক দিবসকে সামনে রেখে আগস্টের প্রথম দিন থেকে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। তথ্য মন্ত্রণালয়সহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশও (পিআইবি) শোক দিবসকে সামনে রেখে নানা কর্মসূচি পালন করছে। এই ক্ষেত্রে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রয়েছে পিআইবির পক্ষ থেকে।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হোক আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জাতির পিতার প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।


**সম্পাদক**
**জাফর ওয়াজেদ**

**সহযোগী সম্পাদক**
ফায়জুল হক

**সহকারী সম্পাদক**
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

**সহ-সম্পাদক**
আকিল উজ জামান খান

**শিল্প নির্দেশনা**
মোমিন উদ্দীন খালেদ

**প্রকাশনা কর্মকর্তা**
সরদার মো. রেজাউল করিম

**প্রতিবেদক**
নুরুন্নাহার নুরু

**সংশোধক**
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

* প্রচ্ছদ: শিল্পী শাহাবুদ্দিনের চিত্রকর্ম অবলম্বনে

# সূচিপত্র

**শেখ ফজিলাতুননেছা আমার মা** ৫
শেখ হাসিনা

**১৫ আগস্টের পর অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন** ১১
শেখ রেহানা

**আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও নেপথ্য খুনির মুখ** ১৪
বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

**দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়েই তিনি জাতির পিতা** ২০
মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া

**বঙ্গবন্ধু জনগণের কাছে থেকেছেন আজীবন -মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম** ২২
বনশ্রী ডলি

**ডেটলাইন ১৫ আগস্ট পঁচাত্তর** ৩০
মুহম্মদ শফিকুর রহমান

**বিশ্বমহামারিতে বঙ্গবন্ধুই আমাদের শক্তি** ৩৪
স্বদেশ রায়

**১৯৭৫-পরবর্তী দিনগুলোর দুঃসহ স্মৃতি এবং বঙ্গবন্ধুর কথা** ৩৮
অধ্যক্ষ শেখ আবু হামেদ

৪১ **শেখ কামাল নয় টার্গেট বঙ্গবন্ধু**
পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৪ **বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ও তাঁর ছায়াতলে জীবন**
বাহালুল মজনুন চুন্নু

৪৮ **বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য**
সিমিন হোসেন রিমি

৫১ **বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রে দোসর ও পরিকল্পনাকারী কারা?**
রেজা সেলিম

৫৪ **জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড ষড়যন্ত্র দেশে-বিদেশে**
শ্যামল দত্ত

৫৯ **বঙ্গবন্ধু কেন জাতির পিতা**
মোল্লা জালাল

৬২ **অসমাপ্ত আত্মজীবনীর রেণু**
ইয়াদিয়া জামান

৬৬ **শেষের সেদিনে মুখোমুখি যারা**
জাফর ওয়াজেদ



ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

# জাতীয় শোক দিবস

২০২০

# শেখ ফজিলাতুননেছা আমার মা

**শেখ হাসিনা**

আগস্ট মাস। এই আগস্ট মাসে আমার মায়ের যেমন জন্ম হয়েছে; আবার কামাল, আমার ভাই, আমার থেকে মাত্র দুই বছরের ছোটো, ওরও জন্ম এই আগস্ট মাসে। ৫ আগস্ট ওর জন্ম। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস যে, এই মাসেই ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে জীবন দিতে হয়েছে আমার মাকে। আমার আব্বা, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ১৫ আগস্ট যারা শাহাদতবরণ করেছেন, আমার মা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব, কামাল, জামাল, রাসেল, কামাল-জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা ও রোজী, আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের, আমার ফুপা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর ১৩ বছরের মেয়ে বেবী, ১০ বছরের আরিফ, ৪ বছরের নাতি সুকান্ত, সুকান্তের মা এখানেই আছে। আমার বাবার সামরিক সচিব কর্নেল জামিল, যে ছুটে এসেছিল বাঁচানোর জন্য। এই ১৫ আগস্টে একই সঙ্গে হত্যা করা হয়েছিল শেখ ফজলুল হক মনি, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, এভাবে পরিবারের এবং কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারসহ ১৮ জন সদস্যকে।

এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল কেন? একটাই কারণ– জাতির পিতা দেশ স্বাধীন করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে লাখো মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে সেই যুদ্ধ করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শাহাদতবরণ করেছেন, আমি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। পৃথিবীর ইতিহাসে কত নাম না-জানা ঘটনা থাকে। আমার মায়ের স্মৃতির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্বাধীন জাতি। কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্য আমার বাবা যেমন সংগ্রাম করেছেন, আর তাঁর পাশে থেকে আমার মা, আমার দাদা-দাদি সব

সময় সহযোগিতা করেছেন। আমার মায়ের জন্মের পরই তাঁর পিতা মারা যান। তাঁর মাত্র তিন বছর বয়স তখন। আমার নানা খুব শৌখিন ছিলেন। তিনি যশোরে চাকরি করতেন এবং সব সময় বলেছেন, আমার দুই মেয়েকে বিএ পাস করাব। সেই যুগে টুঙ্গিপাড়ার মতো অজপাড়াগাঁয়ে ঢাকা থেকে যেতে লাগত ২২ থেকে ২৪ ঘণ্টা। সেই জায়গায় বসে এই চিন্তা করা, এটা অনেক বড়ো মনের পরিচয়। তখনকার দিনে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

মিশনারি স্কুলে কিছু প্রাথমিক শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু তারপর আর বেশিদিন স্কুলে যেতে পারেননি, স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল বলে। আর ওই এলাকায় স্কুলও ছিল না। একটাই স্কুল ছিল, জিটি স্কুল। অর্থাৎ গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। যেটা আমাদের পূর্বপুরুষদেরই করা। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় এক মাইলের ওপর, দেড় কিলোমিটারের কাছাকাছি। দূরে কাঁচা মাটির রাস্তা। একমাত্র কাঁচা মাটির রাস্তা দিয়ে যাও অথবা নৌকায় যাও, মেয়েদের যাওয়া একদম নিষিদ্ধ। বাড়িতে পড়াশোনার জন্য পণ্ডিত রাখা হতো। মাস্টার ছিল আরবি পড়ার জন্য। কিন্তু আমার মায়ের পড়াশোনার প্রতি অদম্য একটা আগ্রহ ছিল। মায়ের যখন তিন বছর বয়স, তখন তাঁর বাবা মারা গেলেন। আপনারা জানেন, সেসময় বাবার সামনে ছেলে মারা গেলে মুসলিম আইনে ছেলের ছেলেমেয়েরা কোনো সম্পত্তি পেত না। আমার মায়ের দাদা তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর দুই নাতনিকে তাঁর নিজেরই আপন চাচাতো ভাইয়ের ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যান এবং সব সম্পত্তি দুই নাতনির নামে লিখে দিয়ে আমার দাদাকে মোতাওয়াল্লি করে দিয়ে যান। এর কিছু দিন পর আমার নানিও মারা যান। সেই থেকে আমার মা মানুষ হয়েছেন আমার দাদির কাছে। পাশাপাশি বাড়ি, একই বাড়ি, একই উঠোন। কাজেই দাদি নিয়ে আসেন আমার মাকে। আর আমার খালা দাদার কাছেই থেকে যান।

এই ছোটো বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদের সঙ্গেই তিনি বেড়ে উঠেন ছোটোবেলা থেকেই। ওনার ছোটোবেলায় অনেক গল্প আমরা শুনতাম আমার দাদা-দাদির কাছে, ফুপুদের কাছে। বাবা রাজনীতি করছেন সেই কলকাতা শহরে পড়াশোনা করতেন তখন থেকেই। মানবতার জন্য তাঁর যে কাজ এবং কাজ করার যে আকাঙ্ক্ষা, এর জন্য জীবনে অনেক ঝুঁকি তিনি নিয়েছেন। সেই '৪৭-এর রায়টের সময় মানুষকে সাহায্য করা; যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন মানুষকে সাহায্য করা– সব সময় স্কুলজীবন থেকেই তিনি এভাবে মানুষের সেবা করে গেছেন। আমরা দাদা-দাদির কাছেই থাকতাম। যখন পাকিস্তান হলো, আব্বা যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন, সেসময় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য আন্দোলন করলেন। ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হলেন। প্রথম ভাষা আন্দোলন ১৯৪৮ সালে। ১১ মার্চ ধর্মঘট ডাকা হলো। সেই ধর্মঘট ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রেফতার হলেন।

এরপর '৫৯ সালে ভুখা মিছিল করলেন। তখনও গ্রেফতার, বলতে গেলে '৪৭ থেকে '৪৯ সালের মধ্যে তিন-চারবার তিনি গ্রেফতার হন। এরপর '৪৯ সালের অক্টোবরে যখন গ্রেফতার করে আর কিন্তু তাঁকে ছাড়েনি। সেই '৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন এবং বন্দিখানায় থেকে ভাষা আন্দোলনের তিনি সব রকম কর্মকাণ্ড চালাতেন। গোপনে হাসপাতালে বসে ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে, আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো।

মা শুধু খবরই শুনতেন, এই যে অবস্থা, কাজেই স্বামীকে তিনি খুব কম সময়ই কাছে পেতেন। আমি যদি আমাদের জীবনটার দিকে ফিরে তাকাই এবং আমার বাবার জীবনটা যদি দেখি, কখনো একটানা দুটি বছর আমরা কিন্তু বাবাকে কাছে পাইনি। কাজেই স্ত্রী হিসেবে আমার মা ঠিক এভাবে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু কখনো কোনো দিন কোনো অনুযোগ-অভিযোগ তিনি করতেন না। তিনি সব সময় বিশ্বাস করতেন, তাঁর স্বামী দেশের জন্য কাজ করছেন, মানুষের জন্য কাজ করছেন। যে কাজ করছেন, তা মানুষের কল্যাণের জন্য করছেন। মায়ের দাদা যে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন– প্রচুর জমিজমা। জমিদার ছিলেন। সব সম্পত্তি মায়ের নামে। এর থেকে যে টাকা আসত, আমার দাদা সব সময় সে টাকা আমার মায়ের হাতে দিয়ে দিতেন। একটি টাকাও মা নিজের জন্য খরচ করতেন না, সব জমিয়ে রাখতেন। কারণ জানতেন, আমার বাবা রাজনীতি করেন, তাঁর টাকার অনেক দরকার, আমার দাদা-দাদি সব সময় দিতেন। দাদা সব সময় ছেলেকে দিতেন, এর পরও মা তাঁর ওই অংশটুকু, বলতে গেলে নিজেকে বঞ্চিত করে টাকাটা বাবার হাতে সব সময়ই তুলে দিতেন। এভাবেই তিনি সহযোগিতা শুরু করেন– তখন কতই বা বয়স। পরবর্তী সময়ে যখন '৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয়, সে নির্বাচনে নির্বাচনি প্রচার থেকে শুরু করে নির্বাচনি কাজে সবাই সম্পৃক্ত। আমার মা-ও সেসময় কাজ করেছেন। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর আব্বা আমাকে নিয়ে আসেন। আব্বার ইচ্ছা ছিল আমাদেরকে ভালোভাবে স্কুলে পড়াবেন। এর পরে উনি মন্ত্রিসভার সদস্য হলেন। আবার মন্ত্রিসভা ভেঙে গেল, আমার এখনো মনে আছে, তখন আমরা খুব ছোটো, কামাল-জামাল কেবল হামাগুড়ি দেয়। তখন মিন্টু রোডের তিন নম্বর বাসায় আমরা। একদিন সকালবেলা উঠে দেখি মা খাটের উপর বসে আছেন চুপচাপ, মুখটা গম্ভীর। আমি তো খুবই ছোটো, কিছুই জানি না। রাতে বাসায় পুলিশ এসেছে, বাবাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

মা বসা খাটের উপরে, চোখে দুই ফোঁটা অশ্রু। আমি জিজ্ঞাসা করলাম– বাবা কই। বললেন, তোমার বাবাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। চোখের সামনে থেকে এই প্রথম গ্রেফতার, ১৪ দিনের নোটিশ দিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিল। কোথায় যাবেন মা, কেবল ঢাকায় এসেছেন। খুব কম মানুষকে মা চিনতেন। মন্ত্রী থাকা অবস্থায় ওই বাসায় মানুষে মানুষে গমগম করত; কিন্তু ওইদিন সব ফাঁকা, আমার আব্বার ফুপাতো ভাই, আমার এক নানা– তাঁরা এলেন, বাড়ি খোঁজার চেষ্টা। নাজিরাবাজার একটি বাড়ি পাওয়া গেল। সে বাসায় আমাদের নিয়ে উঠলেন। এভাবেই একটার পর একটা ঘাতপ্রতিঘাত এসেছে। কিন্তু একটা জিনিস আমি বলব যে, আমার মাকে আমি কখনো ভেঙে পড়তে দেখিনি। যত কষ্টই হোক, আমার বাবাকে কখনো বলেননি যে, তুমি রাজনীতি ছেড়ে দাও বা চলে আসো বা সংসার করো বা সংসারের খরচ দাও– কখনো না।

সংসারটা কীভাবে চলবে, সম্পূর্ণভাবে তিনি নিজে করতেন। কোনো দিন জীবনে কোনো প্রয়োজনে আমার বাবাকে বিরক্ত করেননি। মেয়েদের অনেক আকাঙ্ক্ষা থাকে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়ার। শাড়ি, গয়না, বাড়ি, গাড়ি– কতকিছু।

এত কষ্ট তিনি করেছেন জীবনে; কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলেননি। চাননি। '৫৪ সালের পরও বারবার গ্রেফতার হতে হয়েছে। তারপর '৫৫ সালে তিনি আবার মন্ত্রী হন, তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচন করে জয়ী হন। মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। আমরা ১৫ নম্বর আবদুল গণি রোডে এসে উঠি। আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস দেখলে দেখব, সবাই মন্ত্রিত্বের জন্য দল ত্যাগ করে আর আমি দেখেছি বাবাকে যে তিনি সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য নিজের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন, ছেড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন।

কোনো সাধারণ নারী যদি হতো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করত যে, স্বামী মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিচ্ছে। এই যে আমার বাড়ি-গাড়ি এগুলো সব হারাবে, এটা কখনো হয়তো মেনে নিত না। এ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হতো, অনুযোগ হতো; কিন্তু আমার মাকে দেখিনি এ ব্যাপারে একটা কথাও

তিনি বলেছেন। বরং আব্বা যে পদক্ষেপ নিতেন, সেটাকেই সমর্থন করতেন।

সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন ছোট্ট জায়গায়। এরপর আব্বাকে টি-বোর্ডের চেয়ারম্যান করলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব। তখন সেগুনবাগিচায় একটা বাসায় থাকতে দেওয়া হলো। এরপরই এলো মার্শাল ল। আইয়ুব খান যেদিন মার্শাল ল ডিক্লেয়ার করলেন, আব্বা করাচিতে ছিলেন। তাড়াতাড়ি চলে এলেন, ওইদিন রাতে ফিরে এলেন। তারপরই ১১ তারিখ মধ্যরাতে অর্থাৎ ১২ তারিখে আব্বাকে গ্রেফতার করা হলো। আমার দাদি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, গ্রেফতার করার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে যে নগদ টাকা ছিল, আমাদের গাড়ি ছিল, সব সিজ করে নিয়ে যাওয়া হলো।

অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে আমার মাকে দেখেছি সে অবস্থা সামাল দিতে। মাত্র ছয়দিনের নোটিশ দিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিল। মালপত্র নিয়ে রাস্তার উপর আমরা ছোটো ছোটো ভাইবোন। তখন রেহানা খুবই ছোটো। একজন একটা বাসা দিল। দুই কামরার বাসায় আমরা গিয়ে উঠলাম। দিনরাত বাড়ি খোঁজা আর আব্বার বিরুদ্ধে তখন একটার পর একটা মামলা দিচ্ছে, এই মামলা-মোকদ্দমা চালানো, কোর্টে যাওয়া এবং বাড়ি খোঁজা– সব কাজ আমার মা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে করতেন।

আওয়ামী লীগের এবং আব্বার বন্ধুবান্ধব ছিল। আমার দাদা সব সময় চালডাল, টাকাপয়সা পাঠাতেন। হয়তো সে কষ্টটা অতটা ছিল না, আর যদি কখনো কষ্ট পেতেন, মুখ ফুটে সেটা বলতেন না।

এরপর সেগুনবাগিচায় দোতলা একটা বাসায় আমরা উঠলাম। আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকর্মীর অসুখবিসুখ হলে তাকে সাহায্য করা; যারা বন্দি, তাদের পরিবারগুলোকে দেখা; কার বাড়িতে বাজার হচ্ছে না, সে খোঁজখবর নেওয়া এবং এগুলো করতে গিয়ে মা কখনো কখনো গহনা বিক্রি করেছেন। আমার মা কখনো কিছু না বলতেন না।

আমাদের বাসায় ফ্রিজ ছিল, আব্বা আমেরিকা যখন গিয়েছেন, ফ্রিজ নিয়ে এসেছেন। সেই ফ্রিজটা বিক্রি করে দিলেন। আমাদের বললেন, ঠান্ডা পানি খেলে সর্দিকাশি হয়, গলাব্যথা হয়– ঠান্ডা পানি খাওয়া ঠিক না। কাজেই এটা বিক্রি করে দিই। কিন্তু এটা কখনো বলেননি যে, আমার টাকার অভাব। সংসার চালাতে হচ্ছে, আওয়ামী লীগের নেতাদের সাহায্য করতে হচ্ছে। কে অসুস্থ, তাকে টাকা দিতে হচ্ছে। কখনো অভাব কথাটা মায়ের কাছ থেকে শুনিনি। এমনও দিন গেছে বাজার করতে পারেননি। আমাদের কিন্তু কোনো দিন বলেননি আমার টাকা নেই, বাজার করতে পারলাম না। চালডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করেছেন। আচার দিয়ে বলেছেন প্রতিদিন ভাত ভালো লাগে নাকি, আজ আমরা গরিবি খিচুড়ি খাব। এটা খেতে খুব মজা। আমাদের সেভাবে তিনি খাবার দিয়েছেন। একজন মানুষ তাঁর চরিত্র দৃঢ় থাকলে যে কোনো অবস্থা মোকাবিলা করার মতো ক্ষমতা ধারণ করতে পারেন। অভাব-অনটনের কথা, হা-হুতাশ কখনো আমার মায়ের মুখে শুনিনি। আমি তাঁর বড়ো মেয়ে। আমার সঙ্গে মায়ের বয়সের তফাত খুব বেশি ছিল না। তাঁর মা নেই, বাবা নেই– কেউ নেই। বড়ো মেয়ে হিসেবে আমিই ছিলাম মা, আমিই বাবা, আমিই বন্ধু। কাজেই ঘটনাগুলো আমি যতটা জানতাম আর কেউ জানত না। আমি বুঝতে পারতাম। ভাইবোন ছোটো ছোটো, তারা বুঝতে পারত না। প্রতিটি পদে তিনি সংগঠনকে, আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করেছেন। তবে প্রকাশ্যে আসতেন না। তিনি ঠাট্টা করে বলতেন, আমি আইয়ুব খানকে ধন্যবাদ দিই, কেন?

আব্বা '৫৮ সালে অ্যারেস্ট হন, '৫৯ সালের ডিসেম্বরে হেবিয়াস কর্পাস করে মুক্তি পান। সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিজে এসে মামলা পরিচালনা করেন। তখন তিনি জামিনে মুক্তি পান। কিন্তু ইমবার্গো থাকে যে, উনি ঢাকার বাইরে যেতে পারবেন না। রাজনীতি করতে পারবেন না। সব রাজনীতি বন্ধ। ওই অবস্থায় আব্বা ইন্স্যুরেন্সে চাকরি নেন। তখন সত্যি কথা বলতে কী, হাতে টাকাপয়সা, ভালো বেতন, গাড়ি-টাড়ি সব আছে। একটু ভালোভাবে থাকার সুযোগ মা'র হলো। তিনি ঠাট্টা করে বলতেন, আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় আইয়ুব খান এনে দিয়েছিল। উনি চাকরি করছেন, আমি স্থিরভাবে জীবনটা চালাতে পারছি। ওই সময় ধানমন্ডিতে দুইটা কামরা তিনি করেন।

> আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস দেখলে দেখব, সবাই মন্ত্রিত্বের জন্য দল ত্যাগ করে আর আমি দেখেছি বাবাকে যে তিনি সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য নিজের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন, ছেড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন

এরপর '৬১ সালের অক্টোবরে আমরা ধানমন্ডি চলে আসি। এ বাড়িটা তৈরি করার সময় লেবার খরচ বাঁচানোর জন্য মা নিজের হাতে ওয়ালে পানি দিতেন, ইট বিছাতেন। আমাদের নিয়ে কাজ করতেন।

বাড়িতে সবকিছুই ছিল। আব্বা তখন ভালো বেতন পাচ্ছেন। তারপরও জীবনের চলার পথে সীমাবদ্ধতা থাকা বা সীমিতভাবে চলা, সবকিছুতে সংযতভাবে চলা– এই জিনিসটা সব সময় মা আমাদের শিখিয়েছেন।

এরপর তো দিনের পর দিন পরিস্থিতি উত্তাল হলো। '৬২ সালে আবার আব্বা গ্রেফতার হলেন, '৬৪ সালে আবার গ্রেফতার হলেন, আমি যদি হিসাব করি– কখনো আমি দেখিনি দুটো বছর তিনি একনাগাড়ে কারাগারের বাইরে ছিলেন। জেলখানায় থাকলে সেখানে যাওয়া, আব্বার কী লাগবে সেটা দেখা, তাঁর কাপড়চোপড়, খাওয়াদাওয়া, মামলা-মোকদ্দমা চালানো– সবই মা করে গেছেন। সব। পাশাপাশি সংগঠনের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ তাঁর ছিল। বিশেষ করে ছাত্রলীগ তো তিনি নিজের হাতেই গড়ে তোলেন। ছাত্রলীগের পরামর্শ, যা কিছু দরকার তিনি দেখতেন।

১৯৬৪ সালে একটা রায়ট হয়েছিল। আব্বা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই সময় হিন্দু পরিবারগুলোকে বাসায় নিয়ে আসতেন, সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় তাদের শেল্টারের ব্যবস্থা করতেন। ভলেন্টিয়ার করে দিয়েছিলেন রায়ট থামানোর জন্য, জীবনে যত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আমার বাবা করেছেন, আদমজীতে বাঙালি বিহারি রায়ট হলো, সেখানে তিনি ছুটে গেছেন। প্রতিটি সময় এই যে কাজগুলো করেছেন, মা ছায়ার মতো তাঁকে সাহায্য করে গেছেন। কখনো এ নিয়ে অনুযোগ করেননি। এই যে

একটার পর একটা পরিবার নিয়ে আসতেন, তাদের জন্য রান্নাবান্না করা, খাওয়ানো– সব দায়িত্ব পালন করতেন। সব নিজেই করতেন।

এরপর দিলেন ছয় দফা। ছয় দফা দেওয়ার পর তিনি যে সারা বাংলাদেশ ঘুরেছেন, যেখানে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেখানে মামলা হয়েছে, গ্রেফতার হয়েছেন। আবার মুক্তি পেয়েছেন, আবার আরেক জেলায় গেছেন– এভাবে চলতে চলতে '৬৬ সালের ৮ মে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করল।

তারপর তো আর মুক্তি পাননি, এই কারাগার থেকে বন্দি করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেল, পাঁচ মাস আমরা জানতেও পারিনি তিনি কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কি না। সেসময় আন্দোলন গড়ে তোলা, ৭ জুনের হরতাল পালন। আমার মাকে দেখেছি, তিনি আমাদের নিয়ে ছোটো ফুপুর বাসায় যেতেন, কেননা সেখানে ফ্ল্যাট ছিল। ওখানে গিয়ে নিজে পায়ের স্যান্ডেল বদলাতেন, কাপড় বদলাতেন, বোরকা পরতেন। একটা স্কুটারে করে আমার মামা ছিলেন, ঢাকায় পড়ত। তাকে নিয়ে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতেন, আন্দোলন চালাবেন কীভাবে তার পরামর্শ নিজে দিতেন।

তিনি ফিরে এসে আমাদের নিয়ে বাসায় ফিরতেন। কারণ গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন সব সময় নজরদারিতে রাখত। কাজেই গোয়েন্দাদের নজরদারি থেকে বাঁচতে তিনি এভাবেই কাজ করতেন। ছাত্রদের আন্দোলনকে কীভাবে গতিশীল করা যায়, আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং এ হরতালটা যেন সফল হয়, আন্দোলন বাড়ে, সফল হয়; তার জন্য তিনি কাজ করতেন। কিন্তু কখনো পত্রিকায় ছবি ওঠা, বিবৃতি এসবে তিনি ছিলেন না। একটা সময় এলো ছয় দফা না আট দফা– পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেতারা চলে এলেন। আমাদেরও অনেক বড়ো বড়ো নেতা চলে এলেন। কারণ আওয়ামী লীগ এমন একটা দল যে, আওয়ামী লীগের কর্মীরা সব সময় ঠিক থাকেন; কিন্তু নেতারা একটু বেতাল হয়ে যান মাঝে মাঝে। এটা আমার ছোটোবেলা থেকেই দেখা।

এই সময়ও দেখলাম ছয় দফা না আট দফা– বড়ো বড়ো নেতা এলেন করাচি থেকে। তখন শাহবাগ হোটেল আজকে যেটা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। আমার মা মাঝে মাঝে আমাকে পাঠাতেন, যা একটু, নেতারা আসছেন, তাদের স্ত্রীরা আসছেন, তাদের খোঁজখবর নিয়ে আয়। আমার সঙ্গে কে কে আছে দেখে আয়– মানে একটু গোয়েন্দাগিরি করে আসা আর কী। তো আমি রাসেলকে নিয়ে চলে যেতাম। মা'র কাছে এসে যা যা ব্রিফ দেওয়ার দিতাম। তাছাড়া মায়ের একটা ভালো নেটওয়ার্ক ছিল ঢাকা শহরে।

মহানগর আওয়ামী লীগের গাজী গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে কখন কী হচ্ছে– সব খবর আমার মা'র কাছে চলে আসত। তখন তিনি এভাবে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। মফস্বল থেকেও নেতারা আসতেন। তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। কারণ রাজনৈতিকভাবে তিনি যে কত সচেতন ছিলেন, সেটা আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। কাজেই সেই সময় ছয় দফা থেকে একচুল এদিক-ওদিক যাবেন না– এটাই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। এটা আব্বাকে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের নেতারা সব উঠেপড়ে লাগলেন আট দফা খুবই ভালো। আট দফা মানতে হবে, আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে– আমি তখন কলেজে পড়ি, তারপর আমি ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলাম, সেসময় আমাদের নামিদামি নেতারা ছিলেন, কেউ কেউ বলতেন তুমি মা কিছু বোঝ না। আমি বলতাম, কিছু বোঝার দরকার নেই, আব্বা বলেছেন ছয় দফা। ছয় দফাই দরকার, এর বাইরে নয়। আমার মাকে বোঝাতেন, আপনি ভাবি বুঝতে পারছেন না। তিনি বলতেন, আমি তো ভাই বেশি লেখাপড়া জানি না, খালি এইটুকুই বুঝি– ছয় দফাই হচ্ছে বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ। এটা উনি বলে গেছেন, এটাই আমি মানি। এর বাইরে আমি কিছু জানি না। এভাবে তারা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, আমাদের বাসায় ওয়ার্কিং কমিটির তিনদিনের মিটিং। রান্নাবান্না, তখন তো এত ডেকোরেশন ছিল না; অত টাকাপয়সা পার্টির ছিল না। আমার মা নিজের হাতেই রান্না করে খাওয়াতেন। আমরা নিজেরাই চা বানানো, পান বানানো– এগুলো করতাম। তখন আবার পরীক্ষার পড়াশোনা। পরীক্ষার পড়া পড়ব না বক্তৃতা শুনব। একটু পড়তে গিয়ে আবার দৌড়ে আসতাম কী হচ্ছে, কী হচ্ছে, চিন্তা যে আট দফার দিকে নিয়ে যাবে কি না; কিন্তু সেখানে দেখেছি আমার মায়ের সেই দৃঢ়তা, মিটিংয়ে রেজুলেশন হলো যে ছয় দফা ছাড়া হবে না।

নেতারা বিরক্ত হলেন, রাগ করলেন। অনেক ঘটনা আমার দেখা আছে। আব্বার কাছে দেখা করতে যখন কারাগারে যেতেন, তখন মা সব বলতেন। মায়ের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। আমরা মাঝে মাঝে বলতাম তুমি তো টেপরেকর্ডার। মা একবার যা শুনতেন, তা ভুলতেন না। আমাদের কতগুলো কায়দা শিখিয়েছিলেন যে জেলখানায় গিয়ে কী করতে হবে। একটু হইচই করা, ওই ফাঁকে বাইরের সব রিপোর্ট আব্বার কাছে দেওয়া এবং আব্বার নির্দেশটা নিয়ে আসা, তারপর সেটা ছাত্রদের জানানো। স্লোগান থেকে শুরু করে সবকিছুই বলতে গেলে কারাগার থেকেই নির্দেশ দিয়ে দিতেন। সেভাবেই কিন্তু মা ছাত্রলীগকে কাজে লাগাতেন। '৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ওনাকে নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টে। আমরা কোনো খবর পেলাম না, তখন মায়ের যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যখন দেয়, তখন কিন্তু মাকেও ইন্টারগেশন করেছে যে, কী জানে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। উনি খুব ভালোভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা আমাদের দরকার। আমার মনে আছে– ভুট্টোকে যখন আইয়ুব খান তাড়িয়ে দিল মন্ত্রিত্ব থেকে, ভুট্টো চলে এলে তখনকার দিনের ইস্ট পাকিস্তানে এসেই ছুটে গেল ৩২ নম্বর বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

আমাদের বসার ঘরটার নিচে যে ঘরটা আছে, ওখানে আগের দিনে এ রকম হতো যে ড্রয়িং রুম, এরপর ডাইনিং রুম, মাঝখানে একটা কাপড়ের পর্দা। যখন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা আসতেন, পর্দাটা টেনে মা ভেতরে বসে কথা বলতেন। বলতেন, আমি পর্দা করি। আমাদের বলতেন, ওদের সঙ্গে থাকব না, দেখা করব কেন।

আমার আব্বা যে মিনিস্টার ছিলেন, এমপি ছিলেন, এমএলএ ছিলেন– করাচিতে যেতেন, আমার মা কিন্তু জীবনে একদিনও করাচিতে যাননি। কোনো দিন যেতেও চাননি। উনি জানতেন, উনিই বেশি আগে জানতেন যে, এদেশ স্বাধীন হবে। এই যে স্বাধীনতার চেতনায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করা, এটা মায়ের ভেতরে তীব্র ছিল। একটা বিশ্বাস ছিল। আগরতলা মামলার সময় আব্বার সঙ্গে প্রথম আমাদের দেখা জুলাই মাসে। যখন কেস শুরু হলো, জানুয়ারির পর জুলাই মাসে প্রথম দেখা হয়, তার আগ পর্যন্ত আমরা জানতেও পারিনি। ওই জায়গাটা আমরা মিউজিয়াম করে রেখেছি। ক্যান্টনমেন্টে যে মেসে আব্বাকে রেখেছিল এবং যেখানে মামলা হয়েছিল, সেখানেও মিউজিয়াম করে রাখা হয়েছে।

এরপর আমাদের নেতারা আবারও উঠেপড়ে লাগলেন, আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক ডাকল, সেখানে যেতে হবে, না গেলে সর্বনাশ হবে। মা খবর পেলেন। আমাকে পাঠালেন, বললেন আমার সঙ্গে কথা না বলে কোনো সিদ্ধান্ত যেন উনি না দেন। আমাদের বড়ো বড়ো নেতা সবাই ছিলেন, তারা নিয়ে যাবেন, আমার আব্বা জানতেন, আমার উপস্থিতি দেখেই বুঝে যেতেন যে মা কিছু বলে পাঠিয়েছেন। মা খালি বলে দিয়েছিলেন আব্বা কখনো প্যারোলে যাবে না, যদি মুক্তি দেন তখন যাবে। সে বার্তাটাই আমি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম, আর তার জন্য

আমাদের নেতারা বাসায় এসে বকাঝকা। তুমি কেমন মেয়ে, তুমি চাওনা তোমার বাবা বের হোক জেল থেকে। মাকে বলতেন আপনি তো বিধবা হবেন। মা শুধু বলেছিলেন, আমি তো একা না। এখানে তো ৩৪ জন আসামি। তারা যে বিধবা হবে, এটা আপনারা চিন্তা করেন না? আমার একার কথা চিন্তা করলে চলবে? আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ৩৫ জনের মধ্যে ৩৪ জনই তো বিবাহিত। মামলা না তুললে উনি যাবেন না। তার যে দূরদর্শিতা রাজনীতিতে, সেটাই কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার পথ খুলে দিয়েছে। কারণ সেদিন যদি প্যারোলে যেতেন, তাহলে কোনো দিনই আর বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, এটা হলো বাস্তবতা। এরপর অসহযোগ আন্দোলনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি দেখেছি মায়ের দৃঢ় ভূমিকা। ৭ মার্চের ভাষণের কথা বারবারই আমি বলি, বড়ো বড়ো বুদ্ধিজীবী লিখে দিয়েছেন এটা বলতে হবে, ওটা বলতে হবে। কেউ কেউ বলছেন এটাই বলতে হবে, না বললে সর্বনাশ হয়ে যাবে– এ রকম বস্তাকে বস্তা কাগজ আর পরামর্শ। গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে যেতে হলে আমার মা কিন্তু আব্বাকে বলতেন কিছুক্ষণ তুমি নিজের ঘরে থাকো, তাঁকে ঘরে নিয়ে তিনি একটা কথা বললেন যে, তোমার মনে যে কথা আসবে, তুমি সে কথা বলবা। কারণ লাখো মানুষ সারা বাংলাদেশ থেকে ছুটে এসেছে, হাতে বাঁশের লাঠি, নৌকার বৈঠা নিয়ে। আর এদিকে পাকিস্তানি শাসকরাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বসে আছে এই বলে যে, বঙ্গবন্ধু কী নির্দেশ দেন। তারপর মানুষগুলোকে আর ঘরে ফিরতে দেবে না। নিঃশেষ করে দেবে। স্বাধীনতার স্বাদ বুঝিয়ে দেবে, এটাই ছিল পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত। আর সেখানে আমাদের কোনো কোনো নেতা বলে দিলেন যে, এখানেই বলে দিতে হবে যে, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। কেউ বলে, এটা বলতে হবে, ওটা বলতে হবে।

> আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক ডাকল, সেখানে যেতে হবে, না গেলে সর্বনাশ হবে। মা খবর পেলেন। ... মা খালি বলে দিয়েছিলেন আব্বা কখনো প্যারোলে যাবে না, যদি মুক্তি দেন তখন যাবে

মা বাবাকে বললেন, সারাজীবন তুমি সংগ্রাম করেছ, তুমি জেলজুলুম খেটেছ। দেশের মানুষকে নিয়ে যে স্বপ্ন, কীভাবে স্বাধীনতা এনে দেবেন, সে কথাই তিনি ওই ভাষণে বলে এলেন। যে ভাষণ আজ সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণ। আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে যত ভাষণ আছে, যে ভাষণ মানুষকে উজ্জীবিত করেছে, সে ভাষণের শ্রেষ্ঠ একশটি ভাষণের মধ্যে এ ভাষণ স্থান পেয়েছে। যে ভাষণ এদেশের মানুষকে প্রেরণা দিয়েছিল এবং এরপর ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যখন তিনি এলেন, ফোনে বলেছিলেন খসড়াটা ইপিআরের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চলে যাবে। ব্যবস্থাটা সবই করা ছিল, সবই উনি করে গিয়েছিলেন।

জানতেন, যে কোনো সময় তাঁকে গ্রেফতার বা হত্যা করতে পারে। মা সব সময় জড়িত আমার বাবার সঙ্গে, কোনো দিন ভয়ভীতি দেখিনি। যে মুহূর্তে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, তারপরই সেনাবাহিনী এসে বাড়ি আক্রমণ করল, ওনাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। পরের দিন এসে আবার বাড়ি আক্রমণ করল। আমার মা পাশের বাসায় আশ্রয় নিলেন। তারপর এ বাসা, ও বাসা করে মগবাজারের একটা বাসা থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হলো। ১৮ নম্বর রোডের একতলা বাসায় রাখা হলো। খোলা বাড়ি। কিছু নেই, পর্দা নেই। রোদের মধ্যে আমাদের পড়ে থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন। মাকে কখনো ভেঙে পড়তে দেখিনি। সব সময় একটা আত্মবিশ্বাস ছিল, সাহস ছিল, সেই সাহসটাই দেখেছি। এরপর যেদিন পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর সারেন্ডার করে, আমরা কিন্তু সেদিন মুক্তি পাইনি, আমরা পেয়েছি একদিন পরে ১৭ ডিসেম্বর। এখানে একটা ছবি দেখিয়েছে, মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের উপর। মানুষের সঙ্গে হাত দেখাচ্ছে, ওটা কিন্তু বাঙ্কার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ বাড়িতে মাটির নিচে বাঙ্কার করেছিল। কাজেই ওই বাঙ্কারের উপর দাঁড়িয়ে যখন ইন্ডিয়ান আর্মি এসে পাকিস্তান আর্মিকে সারেন্ডার করে নিয়ে গেল, হাজার হাজার মানুষ ওখানে চলে এলো, মা হাত নেড়ে দেখাচ্ছেন।

সারেন্ডার করার সময় গেটে যে সেন্ট্রি ছিল, আমরা ভেতরে বন্দি, আমরা তো বের হতে পারছি না, জানালা দিয়ে মা হুকুম দিচ্ছেন। ওই সিপাহিটার নামও জানতেন, বলছেন যে হাতিয়ার ডালদো। ওই যে হাতিয়ার ডালদো প্রচার তখন তিনি জানতেন, বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জি মা জি বলে অস্ত্রটা নিয়ে বাঙ্কারে চলে গেল। কাজেই ওনার যে সাহসটা, তা ওই সময়েও ছিল। ওইদিন রাতেও আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছে, যেভাবে হোক আমরা বেঁচে গেছি।

আমার মায়ের যে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত আমরা দেখেছি, স্বাধীনতার পর তিনি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বউ হিসেবে বিলাসী জীবনযাপনে ফিরে যাননি। ওই ধানমন্ডির বাড়িতে থেকেছেন। বলেছেন, না, আমার ছেলেমেয়ে বেশি বিলাসিতায় থাকলে ওদের নজর খারাপ হয়ে যাবে, অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।

ওনার জীবনে যেভাবে চলার, ঠিক সেভাবেই উনি চলেছেন; কিন্তু স্বাধীনতার পর যেসব মেয়ে নির্যাতিত ছিল– নির্যাতিত মেয়েদের সাহায্য করা, তাদেরকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া। বোর্ডের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের যখন ব্যবস্থা হয়, ওই মেয়েদের যখন বিয়ে দিতো, মা নিজেও তখন উপস্থিত থেকেছেন। নিজের হাতের নিজের গহনা, আমি আমার গহনাও অনেক দিয়ে দিয়েছিলাম, বলতাম, তুমি যাকে যা দরকার তা দিবা।

তিনি প্রচারবিমুখ ছিলেন। আমাকে একদিন বললেন, মাত্র ১৪ বছরের বাচ্চা মেয়ে তাকে যেভাবে অত্যাচার করেছে, তা দেখে তার খুব মন খারাপ হয়েছে। এভাবে নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানো, যে এসে যা চেয়েছে, হাতখুলে তা দিয়ে দিয়েছেন; দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। দেশের কথাই সব সময় চিন্তা করেছেন।

আমি অনেক স্মৃতির কথা বললাম এ কারণে যে, আমি মারা গেলে অনেকেই হয়তো অনেক কিছু জানবে না। কাজেই এই জিনিসগুলো জানাও মানুষের দরকার। একজন যখন একটা কাজ করে, তার পেছনে যে প্রেরণা শক্তি সাহস লাগে, মা সব সময় সে প্রেরণা দিয়েছেন।

কখনো পিছে টেনে ধরেননি। আমার কী হবে, কী পাব– নিজের জীবনে তিনি কিছুই চাননি। আমি বলতে পারব না যে, কোনো দিন তিনি কিছু চেয়েছেন।

কিন্তু দেশটা স্বাধীন করা, দেশের মানুষের কল্যাণ কীভাবে হবে, সে চিন্তাই তিনি সব সময় করেছেন। স্বাধীনতার পর অনেক সময় আব্বার সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তখন একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ কী ভয়াবহ পরিস্থিতি, তখন সেই অবস্থায়ও তিনি খোঁজখবর রাখতেন। তথ্যগুলো আব্বাকে জানাতেন।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাশে ছিলেন। যখন ঘাতকরা আমার বাবাকে হত্যা করল, তিনি তো বাঁচার আকুতি করেননি। তিনি বলেছেন, ওনাকে যখন মেরে ফেলেছ, আমাকেও মেরে ফেল। এভাবে নিজের জীবনটা উনি দিয়ে গেছেন। সবাইকে নিয়ে চলে গেলেন, আমরা দুই বোন থেকে গেলাম, বিদেশে চলে গিয়েছিলাম মাত্র ১৫ দিন আগে। মাঝে মাঝে মনে হয়– এভাবে বেঁচে থাকা যে কী কষ্টের, যারা আপনজন হারায়, শুধু তারাই বুঝে।

আমি সবার কাছে দোয়া চাই। আমার মায়ের যে অবদান রয়েছে দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং দেশকে যে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, এদেশের মানুষ আব্বার সঙ্গে একই স্বপ্নই দেখতেন যে, এ দেশের মানুষ সুন্দর জীবন পাবে, ভালোভাবে বাঁচবে। গরিব থাকবে না। আব্বা যে এটা করতে পারবেন, এ বিশ্বাসটা সব সময় তাঁর মাঝে ছিল। কিন্তু ঘাতকের দল তো তা দিল না।

কাজেই সে অসমাপ্ত কাজটুকু আমাকে করতে হবে, আমি সেটাই বিশ্বাস করি। এর বাইরে আর কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। তবে আমার মায়ের সারাজীবন দুঃখের জীবন, আর সেই সঙ্গে মহান আত্মত্যাগ তিনি করে গেছেন। আমি তাঁর জন্য সবার কাছে দোয়া চাই। ১৫ আগস্ট যারা শাহাদতবরণ করেছেন, সবার জন্য দোয়া চাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাঁকে বেহেশত নসিব করেন।

**লেখক: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**


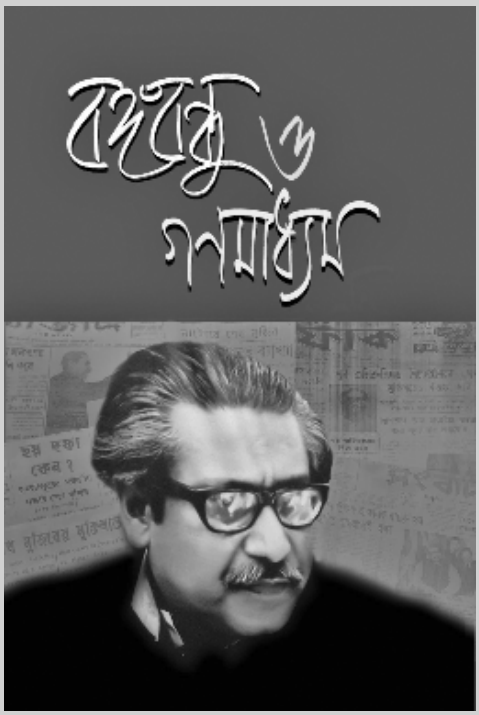


**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

# ১৫ আগস্টের পর অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন

**শেখ রেহানা**

আমার বয়সি মেয়েদের সঙ্গে ওই রাতে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম। হাসাহাসির তীব্র শব্দে দুলাভাই একপর্যায়ে এসে ধমক দিলেন আমাকে। বললেন, 'এত হাসাহাসি ভালো নয়, এতে সারাজীবন কাঁদতে হতে পারে।' দুলাভাই যত বলেন, আমরা আরও বেশি হাসাহাসি করি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই যে আমার এই হাসি চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে, তা তখন কল্পনাই করতে পারিনি। ১৫ আগস্ট ভোরে আপার ডাকে ঘুম ভাঙে। তিনি বললেন, 'তাড়াতাড়ি ওঠো, ঢাকায় গোলমাল হয়েছে।' গোলমাল, রাজনীতির কারণে আব্বার জেলে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় স্বাধীনতার আগে আমাদের জন্য স্বাভাবিক ঘটনা হলেও এই গোলমাল যে তেমন স্বাভাবিক ঘটনা নয়, তা বুঝতে অবশ্য আমাদের অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

আগের দিন রাষ্ট্রদূত সানাউল হক সাহেবের (সানাউল হক ব্রাসেলসে নিযুক্ত বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত) বাসায় এসে উঠেছি। আমরা প্রেসিডেন্টের মেয়ে, খাতির-যত্নের কী বাহার! পরদিন পৃথিবীতে আমাদের কেউ নেই। নিঃস্ব-অসহায় আমরা দুই বোন তখন সানাউল হক সাহেবের কাছে বোঝা হিসেবে পরিগণিত হলাম। আমাদের সরিয়ে দিতে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। সানাউল হক নার্ভাস হয়ে আমাদের সরিয়ে দিতে অস্থির হয়ে উঠলেও তার মেয়েরা ছিলেন খুবই আন্তরিক। তারা সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, অভয় দিচ্ছিলেন।

জার্মানিতে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। তখন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ফেরেশতার মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। ব্রাসেলস ও জার্মানির বর্ডারে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আমাদের জন্য গাড়ি পাঠালেন। আমরা সোজা 'বন'-এ গিয়ে তাঁর বাসায় উঠি। পরে

শুনেছি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকেও টেলিফোন করে সানাউল হক বলেছেন, 'এসব ঝামেলা আপনি আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি সরান।'

আমাদের আশ্রয় দিতে গিয়ে ঝামেলাও পোহাতে হয়েছে তাদের। কয়েকজন বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি ছেলে বনে হাইকমিশন ভবন ঘেরাও করে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামানোর জন্য চৌধুরীকে চাপ দেন। আমাদের বের করে দিতেও বলেন তাকে। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এমন চাপে নতিস্বীকার না করে উলটো তাদের বলেন, 'এই ভবন এখনো বাংলাদেশের। ঢাকা থেকে আমি কোনো নির্দেশ পাইনি। তোমরা যদি বেশি ঝামেলা করো আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।' ছেলেরা তখন চলে যায়। এরপর গুজব ছড়িয়ে পড়ে, ক্ষমতা দখলকারীদের নির্দেশে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তার বাসায় হাসিনা-রেহানাকে বন্দি করে রেখেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকরা তখন ভিড় জমান চৌধুরীর বাসার সামনে। তারা জানতে চান আসলেই হাসিনা-রেহানা বন্দি কি না? হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তখন আমাদের এসে বলেন, 'তোমরা কি একটু জানালার কাছে গিয়ে তোমাদের প্রকৃত অবস্থান জানাবে?' আমরা তখনই জানালার কাছে গিয়ে সাংবাদিকদের বললাম, আমরা এখানে আশ্রয় পেয়েছি, বন্দি নই। আমাদের কথা শুনে তারা চলে যান।

আমরা দুই বোন ছাড়া যে আমাদের পরিবারের আর কেউ-ই বেঁচে নেই, এ খবরটি সঠিকভাবে পেতে আমাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। লন্ডনসহ বিভিন্ন স্থান থেকে টেলিফোন আসছিল। কেউ বলছেন মা ও রাসেল বেঁচে আছেন। তারা ওইদিন ছোটো ফুপুর বাসায় ছিলেন। কেউ বলছেন, জামাল ভাই সদ্যনিয়োগপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার, তিনি ব্যারাকে ছিলেন এজন্য বেঁচে গেছেন, আবার কেউ বলছেন কামাল ভাইয়ের ক্রিকেট টিম নিয়ে মালয়েশিয়া যাওয়ার কথা, তিনি সেখানে চলে গেছেন, ভাবি চলে গেছেন তার বাবার বাসায়, সুতরাং তারা বেঁচে আছেন। কিন্তু কোনো খবরই সঠিকভাবে কেউ বলতে পারছিলেন না।

ড. কামাল হোসেন বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি তখন দেশের বাইরে সফরে ছিলেন। ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে তার কাছেও সঠিক কোনো খবর ছিল না। কামাল হোসেন সাহেবকে বললাম, চাচা আপনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী, একটি প্রেস কনফারেন্স করে বিশ্ব মিডিয়াকে প্রকৃত অবস্থা একটু বলুন। আমাদের কূটনৈতিক মিশনগুলোকে ডিফেন্ড করতে অনুরোধ করুন। কিন্তু তিনি আমার অনুরোধের গুরুত্ব দিলেন না। হয়তো ছোটো মানুষ হিসেবে এই অনুরোধের কোনো গুরুত্ব নেই বলেই তিনি ভেবেছিলেন। তবে ওই সময় যদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন একটি প্রেস কনফারেন্স করতেন, তখন পরিস্থিতি হয়তো অন্যরকম হতো।

আগস্টের ২৪-২৫ তারিখের দিকে আমরা ইন্ডিয়ায় চলে যাই। তখন প্লেনে পত্রিকায় দেখলাম সব শেষ। মা, বাবা, ভাই-বোন কেউ বেঁচে নেই আমাদের। এরপরও বিশ্বাস হচ্ছিল না। কেন হবে এমন ঘটনা? পাকিস্তানিরা যেখানে এমন ঘটনা ঘটায়নি, বাঙালিরা কেন করবে? তখনও একটি আশা মনে ছিল, হয়তো অনেকেই বেঁচে আছেন। ঘটনার তিন-চার মাস পর শেখ সেলিম ও আবুল হাসানাত আবদুল্লাহরা যখন কলকাতা থেকে দিল্লি আসেন, তখনই তাদের মুখে সেই কালরাত্রির বিস্তারিত জানলাম। জার্মানিতে রেডক্রস বলল, তারা জানতে পেরেছে মা ও রাসেল বেঁচে আছেন। তারা আরও বলল, তোমরা ইন্ডিয়ায় থাকলে তাদের উদ্ধার করতে আমাদের সুবিধা হবে।

খন্দকার মোশতাক যে ছুরি মারতে পারে, বঙ্গবন্ধুর জানাই ছিল। ১৫ আগস্টের অনেক পর খোকা চাচা (বঙ্গবন্ধুর ফুপাতো ভাই) একদিন বললেন, 'জানিস, মিয়া ভাই খন্দকার মোশতাককে ঠিকই চিনতেন। মোশতাকের হয়ে তাঁর কাছে একবার তদবিরে গিয়েছিলাম।' তিনি বলেছিলেন, 'খোকা, তুই মোশতাকের জন্য তদবির করতে এসেছিস। আমাকে যদি কেউ পেছন থেকে ছুরি মারে, তা মোশতাকই মারবে।'

এরপরও সহকর্মী, বন্ধুবান্ধবের প্রতি আব্বার ছিল অগাধ বিশ্বাস। এমনও শুনেছি, ঘটনার রাতে ১২টা পর্যন্ত মোশতাক ৩২ নম্বরে ছিলেন। তাদের পরিকল্পিত অভিযান সম্পর্কে কেউ কিছু আঁচ করতে পারছে কি না, তা অবজার্ভ করতে তিনি ওইখানে ছিলেন।

স্বাধীনতার আগে মোশতাক যখন জেলে, তখন তার অসুস্থ স্ত্রীর সব দায়দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমার মা। আমার দাদির মৃত্যুর পর মোশতাকের সেই অস্বাভাবিক কান্না এখনো আমার চোখে ভাসে। মোশতাক সেদিন মাটিতে গড়াগড়ি করে কান্নাকাটি করেন, যা অনেককেই অবাক করেছে। তখন তো আর বুঝতে পারিনি, আব্বার বিশ্বাসে ঢুকতে এ ছিল তার অভিনয়। কী আর করা, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে তো ব্রুটাস, মীরজাফরদের আবির্ভাব ঘটে, মোশতাকের আগমনও আমরা সেভাবেই দেখি।

আমার দাদির মৃত্যুর পর মোশতাকের সেই অস্বাভাবিক কান্না এখনো আমার চোখে ভাসে। মোশতাক সেদিন মাটিতে গড়াগড়ি করে কান্নাকাটি করেন, যা অনেককেই অবাক করেছে। তখন তো আর বুঝতে পারিনি, আব্বার বিশ্বাসে ঢুকতে এ ছিল তার অভিনয়

যতটুকু দেখেছি আব্বা আর তাজউদ্দীন কাকা ছিলেন একপ্রাণ, এক আত্মা। খন্দকার মোশতাক হয়তো তাঁদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছেন। বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিল জয় আর পুতুল। সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকতাম, খাওয়াদাওয়া কিছুই নেই। জয়-পুতুল যখন কেঁদে উঠত, তখন তাদের খাবার দিতে স্বাভাবিক হতে হতো আমাদের। শুধুই আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতাম। দুলাভাইয়ের এক বন্ধু ড. শহীদ আমাদের কিছু দোয়া লিখে দিয়ে বললেন, 'কান্নাকাটি না করে তোমরা এ দোয়াগুলো পড়তে থাকো।' এই দোয়াগুলো পড়তে থাকলাম আমরা। আপাকে সান্ত্বনা দিই আমি, আমাকে সান্ত্বনা দেন আপা। এই আমাদের অবস্থা। মা-বাবার খুনিদের বিচারের কাঠগড়ায় তোলার আশাই আমাদের নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। ভারতে আসার বেশ কিছুদিন পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে পড়ালেখার সুযোগ করে দিতে বললে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা হয় এবং এর মধ্যে কলকাতার শান্তিনিকেতনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। শান্তিনিকেতনে আসার

জন্য ট্রেনে উঠব, এমন সময় খবর পেলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলছে, আমার নিরাপত্তা দিতে পারবে না। আবার ফিরে এলাম আপার কাছে। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পাওয়ায় শান্তিনিকেতনে যেতে না পেরে লন্ডনে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিই। লন্ডনে তখন আমার এক চাচা ও ট্রেনিংয়ে আসা আমার ফুপা সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান অবস্থান করছিলেন। ফুপা জেনারেল মুস্তাফিজ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশে আর ফিরবেন না। কারণ, চাকরিতে বিভিন্নভাবে তাকে হয়রানি করা হচ্ছিল। আমি তাকে একটি চিঠি লিখে অনুরোধ করি, ফুপা আপনাকে চাকরিতে ফিরতে হবে। আমাদের অনেক কাজ বাকি, অভিমান করলে চলবে না। ১৫ আগস্টের খুনিদের বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে আসতে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। ফুপা আমার কথা রাখলেন। আমার এই চিঠি এখনো ফুপুর কাছে আছে।

১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে একা একা বাসে করে ব্রিটিশ হাইকমিশনে গিয়ে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করি। সাতদিন পর আসতে বললে হাইকমিশন ত্যাগ করে যখন বের হচ্ছি, ঠিক তখনই এক অফিসার এসে আমার কাছে জানতে চান, আমি শেখ মুজিবের মেয়ে কি না। উত্তর হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলে তিনি আমাকে ভেতরে নিয়ে একটি রুমে বসতে বলেন। কিছুক্ষণ পর আরেক কর্মকর্তা, সম্ভবত ডেপুটি হাইকমিশনার এসে আমাকে দু-একটি প্রশ্ন করে চলে যান। তিনি চলে যাওয়ার পরই আরেক কর্মকর্তা এসে আমাকে পরের দিন আসার জন্য বলেন। পরের দিন ভিসাসহ আমার হাতে পাসপোর্টটি যখন দেওয়া হলো, তখন দেখলাম ভিসার ওপর লেখা 'ডটার অব লেট শেখ মুজিবুর রহমান'। এটি দেখে মনটা তখন ভরে গেলেও তাৎক্ষণিক আবার খারাপ হয়ে যায় এই ভেবে যে, বিশ্বব্যাপী এত শ্রদ্ধেয় আমার বাবাকে মেরে ফেলল দেশেরই কজন বিপথগামী।

ভিসার পর টিকিটের পয়সার জন্য অনেককেই অনুরোধ করে চিঠি লিখি। বলি, লন্ডনে এসে চাকরি করে এই পয়সা শোধ করে দেব। কিন্তু কেউই অর্থ দেননি। শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বলতে হলো বিষয়টি। মিসেস গান্ধী তখন বললেন, 'কেন তুমি ইন্ডিয়া ছাড়বে, এখানেই লেখাপড়া করো।' পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিরাপত্তা দিতে রাজি নয়, সে বিষয়টি তাকে জানালাম। তিনি বিষয়টি জানতেন না। শেষ পর্যন্ত মিসেস গান্ধীই লন্ডনের একটি বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা করেন। লন্ডনে এসে উঠি খোকা চাচার বাসায়।

লন্ডনে থাকার জায়গা, আশ্রয় কিছুই ছিল না। লন্ডনে এসে গাফ্ফার চাচা, এমআর আখতার মুকুলসহ দু-একজন মানুষের সঙ্গে মাত্র যোগাযোগ হয়। হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকি চাকরি। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বিচারের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার পরিকল্পনাও করতে থাকি। সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় একটি চাকরি। এমন অসহায় সময়ে বিয়ের প্রস্তাব আসে। মাথার উপর একটি ছায়ার আশায় প্রস্তাবে রাজি হই।

লন্ডনে এসে বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত কমিটি গঠনের চেষ্টা করতে লাগলাম। নোবেল বিজয়ী শন ম্যাবক্রেব্রাইট, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর মতিন চৌধুরী, গাফ্ফার চাচা, ড. কামাল হোসেনসহ অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। অনেক চেষ্টার পর সাক্ষাৎ পেলাম স্যার থমাস উইলিয়ামের। উনি তখন রানির কুইন্স কাউন্সিলর হয়ে লর্ডস সভার সদস্য। আমি তাকে চিনতাম, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে উনি যখন ঢাকায় গিয়েছিলেন, আমি তখন তাকে চা-নাশতা করে খাইয়েছি। থমাস উইলিয়ামও আমাকে দেখে চিনলেন। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'দূর থেকে তোমাকে দেখে মনে হয়েছে বেগম মুজিব হেঁটে আসছেন।' আমার সঙ্গে তখন ড. সেলিমও ছিলেন। সৈয়দ আশরাফ ভাই যেতে পারেননি কী কারণে জানি। থমাস উইলিয়াম আমাদের সব ধরনের সাহায্য করতে রাজি হলেন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের সব ধরনের সাহায্য করব; কিন্তু নিজে কিছুতে থাকতে পারব না। কারণ, আমি এখন কুইন্স কাউন্সিলর।'

এরপর ১৯৭৯ সালে সুইডেন যাই। সেখানেই প্রথম শেখ হাসিনার নাম দিয়ে ব্যানার টানিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। আমার তখন পাসপোর্ট নেই। পাসপোর্ট আগেই কেড়ে নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া একটি ট্রাভেলস ডকুমেন্টস নিয়ে যাই সুইডেন। এরপর ইন্টারন্যাশনাল মার্ডার ইনকোয়ারি কমিটি গঠিত হয়। থমাস উইলিয়ামই দুজন আইনজীবী ঠিক করে দেন। আইনজীবীদের ঢাকা যাওয়ার টিকিটের পয়সা সংগ্রহ করা হয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকে।

শেষ পর্যন্ত আর ঢাকা যাওয়া হয়নি এই টিমের। আইনজীবীরা যেদিন ভিসার জন্য হাইকমিশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, সেদিন পুরো হাইকমিশনই বন্ধ করে রাখা হয়। এরপরও হতাশ না হয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত ও বিচারের দাবিতে তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকি।

সুইডেন থেকে ফিরে আসার পর লন্ডনে আমার সাক্ষাৎ হলো মালেক উকিল, সামাদ আজাদ ও ড. কামাল হোসেন সাহেবের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে নিয়ে আমি ওয়েস্ট মিনস্টারের কাছে একটি রেস্টুরেন্টে প্রেস কনফারেন্স করলাম। সেটি আওয়ামী লীগ নেতা আতা খান সাহেবের রেস্টুরেন্ট। ওই প্রেস কনফারেন্সে আমি একটি লিখিত বক্তব্য রাখলাম। সাংবাদিকদের সব প্রশ্নের জবাব দিলেন ড. কামাল হোসেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দাবির এই ক্যাম্পেইন নিয়েও অনেক বিদ্রুপ সইতে হয়। লন্ডনে আসার পর চাকরির জন্য যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি, তখন কত পরিচিতজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সবাই এড়িয়ে যেতে চায়। চাকরি নিলাম একটি লাইব্রেরি ও পাবলিশার্স কোম্পানিতে। এরপর তো অনেক পথ পাড়ি দিলাম।

আমাদের বাসায় রাতদিন আসা-যাওয়া করতেন এমন ব্যক্তিও রাস্তায় দেখা হলে চোখ ফিরিয়ে নিতেন। অবশ্য কেউ কেউ সাহায্যও করেছেন। এর মধ্যে একজন শিপিং করপোরেশনের বড়ো অফিসার এ জেড আহমেদ আমাকে খুবই সাহায্য করেছেন। আব্বার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রুহুল কুদ্দুস ও মঈনুল ইসলাম সাহেবও আমার খোঁজখবর নিয়েছেন নিয়মিত। রুহুল কুদ্দুস ও তার স্ত্রী আমার বিয়ের সময় খাবার রান্না করেন। আর বিয়ের উকিল ছিলেন মঈনুল ইসলাম সাহেব। তারা আমার মুরুব্বি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তখন। আরেকজন ভদ্রলোক ড. শহীদুল্লাহর নাতি মনসুরুল হক, তাকে আমরা হিরু মামা বলে ডাকি, তিনি আমার জন্য অনেক করেছেন।

**লেখক: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ কন্যা**

# আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও নেপথ্য খুনির মুখ

## বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নরপিশাচরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে জিয়াকে সেনাপ্রধান এবং মোশতাককে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বসায় বন্দুকের জোরে। মোশতাক ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর একটি তথাকথিত বেআইনি অধ্যাদেশ জারি করে ১৫ আগস্ট প্রাতঃকালে সাধিত সব পদক্ষেপের জন্য সব ব্যক্তিকে বিচার থেকে মুক্তি দেয়। ১৫ আগস্ট থেকেই অস্ত্রের বলে দেশের ক্ষমতা কেড়ে নেয় পাকিস্তানপন্থি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধীরা। এর পরে জিয়া তার মুখোশ খুলে আসল রূপে আবির্ভূত হয়ে অস্ত্রের বলে তথাকথিত প্রধান সামরিক শাসকের পদ থেকে রাষ্ট্রপ্রধান বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। জিয়া সব প্রত্যক্ষ খুনি মেজর ও জুনিয়র কমিশন অফিসারকে পৃথিবীর বিভিন্ন দূতাবাসে লোভনীয় কূটনৈতিক পদে পদায়ন করে পদোন্নতিসহ। অতঃপর ১৯৭৯ সালে জিয়া সেই তথাকথিত অধ্যাদেশকে শক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য সেটিকে তথাকথিত আইনের রূপ দেয়।

এর মধ্যেও লালবাগ থানাসহ বিভিন্ন থানায় বঙ্গবন্ধুসহ অন্য শহিদদের হত্যার জন্য এজাহার করতে গেলে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের ধুয়া তুলে কোনো থানাই এজাহার গ্রহণ করেনি। জিয়া হত্যার পর যারা ক্ষমতা দখল করে, তারাও সবাই ছিল শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বে পাকিস্তানপন্থি। তারাও খুনিদের বিচারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এরপর নির্বাচনের মাধ্যমে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এলেও এদের বিচারের কথা ভাবেনি। অবশেষে ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলে বঙ্গবন্ধুকন্যা, যিনি বিদেশে ছিলেন বলে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই মনোযোগী

হন বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার, আত্মীয়-পরিজন এবং জাতীয় চার নেতা হত্যাকারীদের বিচারের জন্য। এ উদ্দেশ্যে তৎকালীন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আবদুল মতিন খসরু ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ রহিত করার নিমিত্তে একটি বিল উত্থাপন করেন। কাছাকাছি সময়ে হাইকোর্টেও উঠে ইনডেমনিটি আইনের বৈধতার প্রশ্ন। হাইকোর্ট এটি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় অবৈধ বলে ঘোষণা করেন এবং পাশাপাশি সংসদেও ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ রহিতকরণের আইনটি ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর রহিত হলে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা দায়ের করার পথে সব প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়। ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর আবাসিক পিএ আ ফ ম মহিতুল ইসলাম ধানমন্ডি থানায় ২৪ জনকে আসামি করে এজাহার করেন, যা সে থানা গ্রহণ করে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুযায়ী তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়।

১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি তদন্ত সমাপ্তির পরে পুলিশ অভিযোগপত্র দাখিল করে সেই ২৪ জনের বিরুদ্ধেই। তবে এদের মধ্যে চারজনের মৃত্যু হওয়ায় ২০ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে মামলার শুনানি শুরু হয় ঢাকার বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ গোলাম রসুলের আদালতে। উল্লেখ্য, অনেকে তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আইন প্রণয়ন করে মামলাটি বিশেষ আদালতে করার জন্য বললেও তিনি সে উপদেশ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, দেশের নিয়মমাফিক দায়রা আদালতেই বিচার হবে।

কয়েকজন আর্মি গুলি ছুড়তে ছুড়তে দোতলায় ওঠে। তখন বঙ্গবন্ধুর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এরপর অনেক গুলির শব্দ এবং মহিলাদের আহাজারি ও আর্তচিৎকার

১৫০ দিন শুনানির পর বিজ্ঞ দায়রা আদালত ১৫ আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এদের মধ্য থেকে চারজন হাইকোর্টে আপিল করে। তবে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুযায়ী ১৫ জনের মামলাই চলে যায় হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্সে। এর মধ্যেই অনেক নাটক ঘটে যায়। হাইকোর্টের ১১ জন বিচারপতি এ মামলা শুনতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল শুনানি বিলম্বিত হয়। উল্লেখ্য, তাদের অনিচ্ছা ছিল বেআইনি এবং অভূতপূর্ব।

অবশেষে মাননীয় বিচারপতি মো. রুহুল আমিন ও মাননীয় বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের দ্বৈত বেঞ্চ ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল শুনেন। তাদের রায় দ্বিধাবিভক্ত হয় এ অর্থে যে, মাননীয় বিচারপতি মো. রুহুল আমিন ১০ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন এবং মাননীয় বিচারপতি খায়রুল হক বহাল করেন ১৫ আসামির দণ্ডাদেশ। আইন অনুযায়ী তৃতীয় বেঞ্চে বিষয়টি চলে যায়। সেখানে মাননীয় বিচারপতি মো. ফজলুল করিম মামলাটির শুনানি শেষে মোট ১২ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে তিনজনকে খালাস দেন। পরবর্তী সময়ে আপিল বিভাগ হাইকোর্ট প্রদত্ত ১২ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন।

বিচারিক আদালতে অর্থাৎ ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে সর্বমোট ২০ জনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। কিন্তু পরে আসামি জোবেদা রশিদকে হাইকোর্ট বিভাগ এক আদেশবলে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দিলে অভিযুক্ত আসামির সংখ্যা কমে ১৯ জনে দাঁড়ায়।

বিচারিক আদালতে অভিযোগপত্রে মোট ৭২ জন সাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হলেও রাষ্ট্রপক্ষ মোট ৬১ জন সাক্ষী উপস্থাপন করে। এই ৬১ জন সাক্ষীর প্রত্যেকেই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সাক্ষ্যে অপরাধীদের ভূমিকা পরিষ্কার জানা যায়।

১নং সাক্ষী এজাহারকারী আ ফ ম মহিতুল ইসলাম, যিনি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির রিসিপশনিস্ট ছিলেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন, ভোর আনুমানিক ৪-৫টায় বঙ্গবন্ধু তাকে বলিলেন দুষ্কৃতকারীরা সেরনিয়াবাতের বাড়ি আক্রমণ করেছে। তিনি এই সাক্ষীকে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করতে বললে এই সাক্ষী বারবার চেষ্টা করেও পুলিশ কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু নিচে নেমে এলেন এবং বঙ্গভবন এক্সচেঞ্জের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। আর ঠিক তখনই একঝাঁক গুলি এই সাক্ষীর কামরার জানালার কাচ ভেঙে দেয়। মুহুর্মুহু গুলি আসতে থাকে– বঙ্গবন্ধু শুয়ে পড়েন, সাক্ষীও শুয়ে পড়েন। গুলি বন্ধ হলে বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ান, সবাইকে বলেন, 'এত গুলি হচ্ছে, তোমরা কী করো?' এই বলে উপরে উঠে গেলেন। এরপর শহিদ শেখ কামাল নিচে নেমে আসেন, বলেন, 'আমি শেখ কামাল, আর্মি ও পুলিশ ভাই আপনারা আমার সাথে আসেন।' তখনই কয়েকজন আর্মি এসে রুমে প্রবেশ করে এবং এদের মধ্য থেকে বজলুল হুদা শেখ কামালের পায়ে গুলি করে। শেখ কামাল বলেন, 'আমি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল।' সঙ্গে সঙ্গে আর্মিরা শেখ কামালকে ব্রাশফায়ার করে। এই সাক্ষী তখনই বুঝতে পারেন শেখ কামাল গুলি খেয়ে মারা গেছেন। বজলুল হুদা তাদেরকে লাইনে দাঁড় করায়। কয়েকজন আর্মি গুলি ছুড়তে ছুড়তে দোতলায় ওঠে। তখন বঙ্গবন্ধুর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এরপর অনেক গুলির শব্দ এবং মহিলাদের আহাজারি ও আর্তচিৎকার। শেখ নাসেরকে এনে লাইনে দাঁড় করায়। এরপর শেখ নাসেরকে বলিল, 'ঠিক আছে, আপনাকে কিছু বলিব না। আপনি ওই কক্ষে গিয়া বসেন।' এই বলিয়া অফিস কক্ষ সংলগ্ন বাথরুমে নিয়া শেখ নাসেরকে গুলি করে। শেখ নাসের পানি পানি বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিলে আর্মিদের একজন বলিল, 'যা পানি দিয়া আয়।' আর্মির লোক তখন নাসেরকে আবার গুলি করে। তখন উপর থেকে কাজের ছেলে আবদুর রহমান ওরফে রমা এবং শেখ রাসেলকে আর্মিরা নিয়ে আসে।

শিশু রাসেল প্রথম এই সাক্ষীকে এবং পরে রমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'ভাইয়া মারবে না তো?' এই সাক্ষীর জবাব ছিল, 'না ভাইয়া, তোমাকে মারবে না।' একজন আর্মি এই সাক্ষীর কাছ থেকে রাসেলকে নেয়। রাসেল মায়ের কাছে যেতে চাইলে তাকে দোতলার দিকে নিয়ে যায়। এরপরই শোনা যায় গুলির শব্দ। মেজর বজলুল হুদা মেজর ফারুককে বলে, 'অল আর ফিনিশড।' সকাল ৮টার দিকে কর্নেল জামিলের মৃতদেহ নিয়ে আসে আর্মির লোক। মেজর ডালিমকে কিছুক্ষণ পর খাকি পোশাকে গেটে অবস্থানরত আর্মিদের সঙ্গে দেখা যায়। সাক্ষী বলেন, 'প্রাক্তন মেজর ফারুক, মেজর ডালিম, মেজর নূর,

মেজর বজলুল হুদা ঘটনার সময় এবং ঘটনার পরে বঙ্গবন্ধুর ৩২নং বাড়িতে দেখিয়াছি।'

২নং সাক্ষী বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ঘরোয়া সহায়ক আবদুর রহমান শেখ ওরফে রমা তার সাক্ষ্যে বলেন, "আনুমানিক ভোর ৫টার দিকে হঠাৎ বেগম মুজিব দরজা খুলিয়া বাহিরে আসেন এবং বলেন, সেরনিয়াবাতের বাসায় দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ করিয়াছে। আমি লেকের পাড়ে যাইয়া দেখি আর্মি গুলি করিতে করিতে আমাদের বাড়ির দিকে আসিতেছে। একসময় কামাল ভাইয়ের আর্তচিৎকার শুনিতে পাই। তারপর বঙ্গবন্ধু দরজা খুলিয়া আবার বাহিরে আসিলে আর্মিরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে। আর্মিদের লক্ষ্য করিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তোরা কী চাস, কোথায় নিয়া যাবি আমাকে!' তাহারা বঙ্গবন্ধুকে তখন সিঁড়ির দিকে নিয়া যাইতেছিল। সিঁড়ির ২-৩ ধাপ নামার পর নিচের দিক হইতে অনেক আর্মি বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে। গুলি খাইয়া সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু সিঁড়িতে লুটাইয়া পড়েন। আমি তখন আর্মিদের পেছনে ছিলাম। তাহারা আমাকে ভেতরে যাইতে বলে। আমি বেগম মুজিবের রুমের বাথরুমে গিয়া আশ্রয় লই। সেখানে গিয়া বেগম মুজিবকে বলি বঙ্গবন্ধুকে গুলি করিয়াছে। ওই বাথরুমে শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, শেখ জামাল ও তার স্ত্রী রোজী, শেখ রাসেল, বেগম মুজিব ও বঙ্গবন্ধুর ভাই নাসের এবং আমি আশ্রয় লই। শেখ নাসের ওই বাথরুমে আসার আগে তার হাতে গুলি লাগে, ইহার পর আর্মিরা আবার দোতলায় আসে এবং দরজা পিটাইতে থাকিলে বেগম মুজিব দরজা খুলিতে যান এবং বলেন, 'মরিলে সবাই একই সাথে মরিব।' এই বলিয়া বেগম মুজিব দরজা খুলিলে আর্মিরা রুমের ভেতর ঢুকিয়া পড়ে এবং শেখ নাসের, শেখ রাসেল, বেগম মুজিব এবং আমাকে নিচের দিকে নিয়া আসিতেছিল। তখন সিঁড়িতে বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুর লাশ দেখিয়া বলেন, 'আমি যাব না, আমাকে এখানেই মেরে ফেলো।' এ কথার পর আর্মিরা দোতলায় তাঁহার রুমের দিকে নিয়া যায়। একটু পরেই ওই রুমে গুলির শব্দসহ মেয়েদের আর্তচিৎকার শুনিতে পাই। আর্মিরা নাসের, রাসেল ও আমাকে নিচতলায় আনিয়া লাইনে দাঁড় করায়। তিনি শেখ নাসের বলিয়া পরিচয় দিলে তাহাকে নিচতলায় বাথরুমে নিয়া যায়। একটু পরেই গুলির শব্দ এবং তাহার মাগো বলিয়া আর্তচিৎকার শুনিতে পাই। শেখ রাসেল মা'র কাছে যাইব বলিয়া কান্নাকাটি করিতেছিল এবং পিএ মহিতুল ইসলামকে ধরিয়া বলিতেছিল, 'ভাই, আমাকে মারিবে না তো?' এমন সময় একজন আর্মি তাহাকে বলিল, 'চলো তোমারে মায়ের কাছে নিয়া যাই।' এই বলিয়া তাহাকে দোতলায় নিয়া যায়। একটু পরেই কয়েকটি গুলির শব্দ ও আর্তচিৎকার শুনিতে পাই। এরপর আমাদের বাসার সামনে একটি ট্যাঙ্ক হইতে কয়েকজন আর্মি নামিয়া ভেতরের আর্মিদের লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করে– ভিতরে কে আছে, উত্তরে ভিতরের আর্মিরা বলে, All are Finished."

৩নং সাক্ষী হাবিলদার কুদ্দুস সিকদার বঙ্গবন্ধুর বাড়ির নিরাপত্তার কাজে ছিলেন। তিনি বলেন, "১৫ তারিখে (শুক্রবার) ভোর আনুমানিক পৌনে ৫টায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে থাকে। তখন কালো ও খাকি পোশাকধারী সৈন্যরা হ্যান্ডসআপ বলতে বলতে বাড়িতে ঢোকে। মেজর নূর ও মেজর মহিউদ্দিন (ল্যান্সার), ক্যাপ্টেন বজলুলকে গেটে দেখতে পাই। তারপর ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নূর বঙ্গবন্ধুর বাড়ির বারান্দায় এসে সেখানে শেখ কামালকে দাঁড়ানো দেখে ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা হাতের স্টেনগান দ্বারা শেখ কামালকে গুলি করে। শেখ কামাল গুলি খেয়ে পড়ে যায়। বজলুল হুদা পুনরায় শেখ কামালকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর উভয়ে ফোর্সসহ গুলি করতে করতে বাড়ির দোতলার দিকে যায়। এই সাক্ষীকে সঙ্গে থাকার হুকুম দিলে সে তাদের পেছনে যায়। ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নূর সিঁড়ি দিয়ে চৌকির উপরে গেলে মেজর মহিউদ্দিন ও সঙ্গীয় ফোর্স বঙ্গবন্ধুকে নিচের দিকে নামিয়ে আনতে দেখা যায়। এই সাক্ষী বলেন, 'আমি ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নূরের পেছনে দাঁড়ানো ছিলাম। এই সময় মেজর নূর ইংরেজিতে কী যেন বলিলেন। তখন মহিউদ্দিন ও তার ফোর্স একপাশে চলিয়া যায়।' এই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'তোরা কী চাস?' এরপরেই ক্যাপ্টেন হুদা ও মেজর নূর হাতের স্টেনগান দ্বারা বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু সিঁড়ির মধ্যে পড়িয়া মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর মেজর মহিউদ্দিন, মেজর নূর, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদাসহ সবাই নিচে নামিয়া আসিয়া দক্ষিণ দিকে গেটের বাহিরে রাস্তায় চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পর মেজর আজিজ পাশা, রিসালদার মোসলেম উদ্দিন ও ল্যান্সারের ফোর্স এবং টু-ফিল্ড আর্টিলারির ফোর্স গেটের সামনে আসে। তারপর মেজর আজিজ পাশা তাহার ফোর্স লইয়া গেটের মধ্য দিয়া বাড়ির দোতলার দিকে যাইতে থাকে। আমিও তাহাদের পেছনে পেছনে যাই। তারপর মেজর আজিজ পাশা তার ফোর্সসহ দোতলায় বঙ্গবন্ধুর রুমের দরজা খোলার জন্য বলে। দরজা না খুলিলে দরজায় গুলি করে। তখন বেগম মুজিব দরজা খুলিয়া দেন। দরজা খুলিয়া বেগম মুজিব রুমের ভেতরে থাকা লোকদের না মারার জন্য কাকুতিমিনতি করেন। কিন্তু তাহার কথা না রাখিয়া একদল ফোর্স রুম হইতে বেগম মুজিব, শেখ রাসেল, শেখ নাসের ও একজন বাড়ির চাকরকে রুম হইতে বাহির করিয়া নিয়া আসে। বেগম মুজিব সিঁড়ির নিচে আসিয়া শেখ মুজিবের লাশ দেখিয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়েন। এরপর বেগম মুজিবকে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর বেডরুমে নিয়া যায়। অপরদিকে শেখ নাসের, শেখ কামাল ও চাকরকে নিচে নামাইয়া নিয়া যায়। মেজর আজিজ পাশা, রিসালদার মোসলেম উদ্দিন হাতের স্টেনগান দ্বারা বঙ্গবন্ধুর বেডরুমে থাকা সবাইকে গুলি করে। সেখানে বেগম মুজিব, শেখ জামাল, শেখ জামাল ও শেখ কামালের স্ত্রী ছিল। তাহারা গুলি খাইয়া মৃত্যুবরণ করে। তখন শেখ রাসেল তাহার মায়ের কাছে যাইবে বলিয়া কান্নাকাটি করিতেছিল, মেজর আজিজ পাশা ল্যান্সারের একজন হাবিলদারকে হুকুম দিলেন, 'শেখ রাসেলকে তাহার মায়ের কাছে নিয়া যাও।' ওই হাবিলদার শেখ রাসেলের হাত ধরিয়া দোতলায় নিয়া যায়। কিছুক্ষণ পর দোতলায় গুলির আওয়াজ ও কান্নাকাটির চিৎকার শুনিতে পাই। তারপর ওই হাবিলদার নিচে গেটের কাছে আসিয়া মেজর আজিজ পাশাকে বলে, 'স্যার সব শেষ।' এরপর গেটের সামনে একটি ট্যাঙ্ক আসে। মেজর ফারুক সাহেব ওই ট্যাঙ্ক হইতে নামিলে মেজর আজিজ পাশা, মেজর নূর, মেজর মহিউদ্দিন, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা তাহার সহিত কথাবার্তা বলেন, তারপর মেজর ফারুক ট্যাঙ্ক নিয়া চলিয়া যান। তখন বাড়ির উত্তর পাশের সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া বঙ্গবন্ধুর বেডরুমে যাই। সেখানে বেগম মুজিব, শেখ জামাল, শেখ জামালের স্ত্রী এবং শেখ কামালের স্ত্রীর লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় দেখি। একই রুমে শেখ রাসেলের চোখ ও মাথার মগজ বাহির হওয়া অবস্থায় তাহার লাশ দেখি।"

৫নং সাক্ষী সুবেদার আবদুল গনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বাড়ির নিরাপত্তা কমান্ডারদের একজন। সাক্ষ্যে তিনি বলেন, ১৪ তারিখ বিকেল ৪টায় তিনি মেজর ডালিমকে মোটরসাইকেলযোগে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন এবং ৫টার সময় ক্যাপ্টেন বজলুল হুদাকেও বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন।

এই সাক্ষী বলেন, "১৫ আগস্ট ভোর ৪টা ১৫ মিনিটে সুবেদার মেজর আবদুল ওয়াহাব জোয়ারদার আসিয়া বলেন, 'তোমাদের পুরাতন গুলি আমাকে দিয়া দাও, আমি তোমাদের নতুন গুলি দিতেছি।' এই বলে তাদের থেকে সেসব পুরোনো গুলি নিয়ে যায়; কিন্তু কোনো নতুন গুলি দেয়নি।"

রাষ্ট্রপক্ষের ৯নং সাক্ষী কর্নেল এ হামিদের সাক্ষ্য থেকে হত্যাকাণ্ডে জিয়াউর রহমানের সম্পৃক্ততার কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি বলেন, "আমরা সিনিয়র অফিসাররা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট টেনিস কোর্টে নিয়মিত টেনিস খেলতাম। ১৪ আগস্ট বিকালবেলা জেনারেল জিয়াউর রহমান, জেনারেল মামুন, কর্নেল খোরশেদ এবং আমি টেনিস খেলিতেছিলাম। তখন আমি লক্ষ করিলাম মেজর ডালিম এবং মেজর নূর টেনিস কোর্টের আশপাশে ঘোরাফেরা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে এদের দুজনকে ওই আগস্টের প্রথম হইতে এইরূপভাবে টেনিস কোর্টের আশপাশে দেখতে পাই। ইহা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কারণ, তাহারা ছিল চাকরিচ্যুত জুনিয়র অফিসার। একদিন জেনারেল শফিউল্লাহ আমাকে বলিলেন, 'এরা চাকরিচ্যুত জুনিয়র অফিসার, এরা কেন এখানে টেনিস খেলতে আসে? এদেরকে মানা করিয়া দিবেন– এখানে যেন না আসে।' খেলা শেষে আমি মেজর নূরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কার অনুমতি নিয়া এখানে খেলতে আসো? জবাবে জানালেন, 'আমরা জেনারেল জিয়ার অনুমতি নিয়া এখানে খেলিতে আসি।"

এই সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কার যে, বঙ্গবন্ধু হত্যার কয়েক ঘণ্টা আগে জিয়াউর রহমান ডালিম ও নূরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ১৪নং সাক্ষী দফাদার আবদুল জব্বার মৃধা বলেন, "মেজর ফারুক সাহেব আসামিদিগকে 'বাই মার্ক ফল ইন' হওয়ার নির্দেশ দিয়া বলিলেন, 'আপনাদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে পুনরায় ফল ইন করা হইয়াছে।' তারপর সিভিল পোশাক পরিহিত লোকদের লক্ষ করিয়া বলেন, ইহারা আর্মির লোক, এই বলে ইনি মেজর ডালিম, ইনি মেজর শাহরিয়ার, অন্যদের নাম আমার স্মরণ নাই। ওনারা যা নির্দেশ দেয়, সেই মতে কাজ করিবেন। কেহ গাফিলতি করিলে বরদাশত করা হইবে না। আমাদের ট্যাঙ্কগুলো কোথায় যাইবে, তাহা ট্যাঙ্ক কমান্ডারগণ জানিবেন।"

> ওই হাবিলদার নিচে গেটের কাছে আসিয়া মেজর আজিজ পাশাকে বলে, 'স্যার সব শেষ।' এরপর গেটের সামনে একটি ট্যাঙ্ক আসে। মেজর ফারুক সাহেব ওই ট্যাঙ্ক হইতে নামিলে মেজর আজিজ পাশা, মেজর নূর, মেজর মহিউদ্দিন, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা তাহার সহিত কথাবার্তা বলেন, তারপর মেজর ফারুক ট্যাঙ্ক নিয়া চলিয়া যান

এই সাক্ষী বলেন, 'আমি যে ট্যাঙ্কে ছিলাম, সেই ট্যাঙ্কের কোনো গোলা ছিল না।'

১৭নং সাক্ষী হাবিলদার সামসুল ইসলাম বলেন, 'আমরা ব্যারাকে ফিরে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় শুনি যে মেজর ডালিম, মেজর ফারুক, ল্যান্সারের মেজর মহিউদ্দিন, আমাদের সিও মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ, মেজর রাশেদ চৌধুরী, মেজর নূর, মেজর বজলুল হুদা, মেজর শাহরিয়ার, মেজর আজিজ পাশা, ক্যাপ্টেন জোবায়ের সিদ্দিকী ও ক্যাপ্টেন মোস্তফাসহ অন্যান্য অফিসার মিলিয়া বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে।'

১৮নং সাক্ষী হাবিলদার আবু তাহের বলেন, 'বিএইচএম আবুল কালাম আমাকে সেখানে আমার কামান লাগাইতে বলিয়া দক্ষিণ দিক হইতে রক্ষীবাহিনী আসিলে তাহাদিগকে প্রতিহত করার নির্দেশ দেয়।'

১৯নং সাক্ষী জিপচালক দফাদার শহিদুর রহমান বলেন, "মেজর ডালিম সাহেব গাড়ি থামানোর নির্দেশ দেন। গাড়ি থামাইলে তিনি স্টেনগানসহ গাড়ি হইতে নামিয়া যান এবং সেরনিয়াবাতের বাড়ির চারদিকে ফোর্স মোতায়েন করেন। অনুমান ১০-১৫ মিনিট পর ফিরিয়া আসিয়া গাড়িতে উঠেন এবং জিপে উঠিয়া জিপ চালাইতে বলেন। নির্দেশ মোতাবেক সেরনিয়াবাতের বাড়ির উত্তর পার্শ্বে রাস্তা দিয়া বর্তমান শেরাটন হোটেলের পূর্বদিকে গোলচত্বরের নিকট পৌঁছিলে সেরনিয়াবাতের বাড়িতে গুলির শব্দ শুনিতে পাই। তখন ডালিম সাহেব জিপ থামাইতে বলেন, গাড়ি থামাইয়া পুনরায় সেরনিয়াবাতের বাড়ির দিকে আসি। সেরনিয়াবাতের বাড়ি অতিক্রম করিলে মেজর ডালিম সাহেব গাড়ি থামাইতে বলেন। গাড়ি থামাইলে স্টেনগানসহ তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া যান এবং সেরনিয়াবাতের বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোনায় রাস্তার উপরে দাঁড়ায়।' 'কিছুক্ষণ পর মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ সাহেবকে মেজর ডালিম অস্ত্রের মুখে হেডকোয়ার্টারে নিয়া আসেন। পেছনে পেছনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন আর্মি অফিসারগণ ছিলেন।"

২০নং সাক্ষী কর্নেল জামিলের ড্রাইভার ল্যান্স নায়েক আয়েন উদ্দিন মোল্লা বলেন, "১৫ আগস্ট ভোর অনুমান ৫টার সময় আমার রুমের কলিংবেল বাজিতেছিল। তাড়াতাড়ি করিয়া বাসার সামনে গেলে সাহেব (কর্নেল জামিল) উপর হইতে বলেন, তাড়াতাড়ি গাড়ি বের করো এবং গণভবনে গিয়া যত ফোর্স আছে হাতিয়ারগুলোসহ পাঁচ মিনিটের ভেতর বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার জন্য ফোর্সদের খবর দেওয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশমতো আমি গণভবনে গিয়া ফোর্সদের এই নির্দেশ শুনাইলাম, ফিরিয়া আসার পর আমি সরকারি গাড়ি নিতে চাহিলে তিনি তাহার ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়া যাইতে বলেন। আমি তাহার ব্যক্তিগত গাড়িসহ তাহাকে নিয়া ধানমন্ডি ২৭নং রোডের মাথায় বয়েজ স্কুলের গেটে আসিলে সেখানে গণভবন হইতে আগত ফোর্সগুলো দেখিলাম। আমরা দ্রুত সোবহানবাগ মসজিদের কাছে গেলে দক্ষিণ দিক হইতে শোঁ শোঁ করিয়া গুলি আসিতে দেখি, তখন কর্নেল জামিল সাহেব গাড়ি রাখিতে বলেন। আমি গাড়ি থামাই। সাহেব গাড়িতে বসা ছিলেন। তখন আমি কর্নেল জামিল সাহেবকে ফোর্স অ্যাটাক করানোর জন্য বললাম। উত্তরে তিনি বললেন, 'এটা ওয়ার ফিল্ড নয়। অ্যাটাক করা হইলে সিভিলিয়ানদের ক্ষতি হইতে পারে।' ইহার পর তিনি আমাকে প্রতিপক্ষের অবস্থান জানিয়া আসিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি চাবি গাড়িতে রাখিয়া দেওয়াল ঘেঁষিয়া বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে যাইতে থাকি। কিছুদূর যাওয়ার পরে দক্ষিণ দিক হইতে আর্মির পোশাক পরিহিত ৫-৬ জনকে অস্ত্রসহ কর্নেল সাহেবের গাড়ির দিকে দৌড়াইয়া যাইতে দেখি। অবস্থা খারাপ বুঝিতে পারিয়া আমি কর্নেল সাহেবকে পেছনে যাওয়ার জন্য হাত দিয়া ইশারা দেই। কিন্তু তিনি আমার দিকে দেখেন না। এ সময়ে সেনাবাহিনীর লোকগুলো গাড়ির কাছে পৌঁছিয়া যায়। কর্নেল জামিল সাহেব দুই হাত উঁচু করিয়া ওই সেনাবাহিনীর লোকগুলোকে কিছু বলার বা বোঝানোর চেষ্টা করিতেছিল। এই সময় কর্নেল জামিল সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া ২-৩টা ফায়ার করা হয়। তিনি মাটিতে পড়িয়া যান।"

২৪নং সাক্ষী হাবিলদার মোহাম্মদ আমিনুর রহমান বলেন, "ডিউটিতে দাঁড়ানোর পর আমার সঙ্গীয় সৈনিকগণ বলে, একটু আগে

আমরা যে বাড়ি হইতে আসলাম ওই বাড়িটি মন্ত্রী সেরনিয়াবাতের সরকারি বাসভবন। মেজর রাশেদ চৌধুরী এবং অন্য অফিসাররা স্টেনগানের ব্রাশফায়ার মারিয়া সেরনিয়াবাতের এবং তাহার পরিবারের লোকজনকে হত্যা করিয়াছে। ইহার কিছুক্ষণ পর মেজর ডালিম, মেজর নূর, মেজর শাহরিয়ার, মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ, মেজর রাশেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন মাজেদ, ক্যাপ্টেন মোশতাক সাহেবসহ অন্য অফিসারগণ রেডিও সেন্টারের ভেতরে যান। বেশ কিছুক্ষণ পর খন্দকার মোশতাক আহমেদ সাহেবের সঙ্গে মেজর খন্দকার আবদুর রশিদকে রেডিও সেন্টারে আসিতে দেখি।"

২৫নং সাক্ষী নায়েক মো. ইয়াছিন বলেন, 'একপর্যায়ে ট্যাঙ্ক বাহিনীর লোকেরা দরজা ভাঙিয়া বাড়ির (সেরনিয়াবাতের) ভেতর ঢুকিয়া পড়ে। কিছুসংখ্যক সৈনিক দোতলায় উঠিয়া সেরনিয়াবাত ও তাঁহার স্ত্রীকে নিচতলায় নিয়া আসে। সেরনিয়াবাতের সাথে কয়েকজন মহিলাও ছিল। মেজর রাশেদ চৌধুরী তাহার স্টেনগান দিয়া সেরনিয়াবাত যেখানে ছিল, সেখানে একবার ডানদিক হইতে আবার বামদিক হইতে ব্রাশফায়ার করে। সাথে অন্য অফিসাররাও ফায়ার করে। সেরনিয়াবাতের পাশে ৮-১০ বৎসরের একটি ছেলেও গুলিবিদ্ধ হয়। বামদিক হইতে এক মহিলা ওই ছেলেটিকে বাবা বলিয়া জড়াইয়া ধরে। সাথের অফিসাররা আবারও গুলি করে।'

৩৭নং সাক্ষী বেতার প্রকৌশলী মো. রিয়াজুল হক বলেন, "তখন দেখিতে পাই মেজর ডালিম পূর্বের ন্যায় ঘোষণা দিতেছে– 'শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে। আর্মি ক্ষমতা দখল করিয়াছে, কারফিউ জারি হইয়াছে।' এই ঘোষণা শোনার পরে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর খন্দকার মোশতাক সাহেবের সাথে আলাপ করিয়া বলেন যে, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে– এই ঘোষণা দেওয়া ঠিক হইবে না। এরপর তাহেরউদ্দিন ঠাকুর নিজ হাতে ঘোষণা লিখিয়া দেন যে, শেখ মুজিব এবং তাহার স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করে খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করিয়াছে এবং কারফিউ জারি করা হইয়াছে।"

১৩নং সাক্ষী দফাদার শফিউদ্দিন সরদার বিশেষ করে শেখ ফজলুল হক মনিকে সস্ত্রীক হত্যার কথা এবং অন্য খুনিদের সাথে মোসলেম উদ্দিনের হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "গাড়ি থামিলে রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলী, এলডি মৃধা এবং অন্যরা রাস্তার ডানদিকে রাস্তার পাশে দোতলা একটি বাড়িতে ওঠে। আমি আমার জিপের পাশে দাঁড়ানো ছিলাম। একটু পরেই দোতলায় গুলির আওয়াজ পাই। গুলি শেষ হইতেই রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলী, এলডি মৃধা দ্রুত বাহির হইয়া আসে। রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলী, এলডি মৃধাসহ অন্যরা গাড়ি হইতে নামিয়া দাঁড়ায়। তখন দফাদার মারফত আলীকে আমি জিজ্ঞাসা করি, একটু আগে যে বাড়িতে গুলি করিয়াছে সেই বাড়িটি কাহার এবং কাহাকে গুলি করিয়াছে? উত্তরে দফাদার মারফত আলী বলে, 'শেখ মনি ও তাহার স্ত্রীকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছি।' আমরা ধানমন্ডি ৩২নং রোডের মাথায় আসিয়া দুটি ট্যাঙ্ক দেখি। তখন সকাল হইয়া গিয়াছে। এখানে আসার পর বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনিয়াছি। ইহার পর রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলী, এলডি মৃধা বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে যায়।"

৪৪ ও ৪৫নং সাক্ষী যথাক্রমে কর্নেল সাফায়েত জামিল এবং মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর সাক্ষ্যে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা আরও স্পষ্ট হয়। কর্নেল সাফায়েত জামিল বলেন, "পথিমধ্যে আমি জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসায় যাই এবং তাহাকে শেভরত অবস্থায় পাই। আমার নিকট হইতে ঘটনা শোনার পর তিনি বলিলেন, 'So What? President is killed, Vice President is those, uphold the constitution."

মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ বলেন, "পরের দিন অর্থাৎ ১৫ আগস্ট সকালে দরজা ধাক্কা দিলে আমি বাহির হই এবং দেখি আমার ডিএমআই লে. কর্নেল সালাউদ্দিন (ডাইরেক্টর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স) সেখানে উপস্থিত। আমাকে দেখেই সে জিজ্ঞাসা করে, 'স্যার আপনি কি 'আর্মার ও আর্টিলারি'কে শহরের দিকে যেতে বলেছেন?' আমি বললাম, না তো কেন? সে উত্তরে বলল, 'তারা তো রেডিও স্টেশন, গণভবন এবং ৩২নং রোডের দিকে যাইতেছে।' তাহার কথা শুনে আমি শঙ্কিত হলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, Does Shafayet know about it? সাফায়েত কি ইহা জানে? সে উত্তরে বলিল, 'আমি জানি না স্যার। আমি প্রথমেই আপনার কাছে আসিয়াছি।' তখন তাহাকে বলিলাম, তুমি শীঘ্রই সাফায়েতের কাছে যাও এবং তিনটা পদাতিক ব্যাটালিয়নকে তাহাদের প্রতিহত করার জন্য আমার নির্দেশ জানাও। আমি তাহাকে নির্দেশ দিতেছি। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া আমি রুমে ঢুকে টেলিফোনে প্রথমে বঙ্গবন্ধুকে চেষ্টা করি; কিন্তু পাই না। পরে সাফায়েত জামিল, চিফ অব এয়ার স্টাফ, নেভাল স্টাফ এমএইচ খান, ডেপুটি চিফ অব স্টাফ জিয়াউর রহমান, সিজিএস খালেদ মোশাররফকে ফোন করি। সাফায়েতের সঙ্গে কথা বলার সময় মনে হয়, যেন আমি তাকে ঘুম হইতে উঠাইয়াছি। আমি তখন তাহাকে তিনটা পদাতিক ব্যাটালিয়ন দ্বারা তাহাদেরকে (আর্টিলারি ও আর্মার) প্রতিহত করার নির্দেশ দেই। আমি যখন বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলি, তিনি আমার গলার আওয়াজ শুনে বলে উঠলেন– 'শফিউল্লাহ তোমার ফোর্স আমার বাড়ি অ্যাটাক করেছে, কামালকে বোধহয় মারিয়া ফেলিয়াছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও।' উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম– I am doing something. Can you get out of the house. আমি তখন জিয়া ও খালেদ মোশাররফকে ফোন করি, তখন তাহাদেরকে তাড়াতাড়ি আমার বাসায় আসার কথা বলি। ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে তাহারা আমার বাসায় আসিয়া পড়ে। জিয়া ইউনিফর্ম ও শেড এবং খালেদ মোশাররফ নাইট ড্রেসে নিজের গাড়িতে আসে। ওইখানে আমি দুজনকেই ইতোমধ্যে আমার জানা পরিস্থিতি জানালাম এবং খালেদ মোশাররফকে ৪৬ ব্রিগেডে তাড়াতাড়ি যাইয়া সাফায়েত জামিলকে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দেই; কারণ তখন পর্যন্ত আমার পূর্বের দেওয়া নির্দেশের কোনো তৎপরতা দেখিতে পাইতে ছিলাম না। একপর্যায়ে আমার ডেপুটি চিফ আমাকে বলিলেন, 'Don't send him. He is going to spoil it.' খালেদ মোশাররফকে পাঠাইয়া দিয়া অতঃপর আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারে চলিয়া যাই। পেছনে পেছনে জিয়াও আমার অফিসে চলিয়া আসে। আমি অফিসে পৌঁছার পর খালেদ মোশাররফ বা তাহার নিকট হইতে কিছু খবর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকি এবং 'Outside Formation' কমান্ডারদের সাথে টেলিফোনে কথা বলি। যাহাদের সাথে কথা বলি, তাহাদেরকে শুধু বলি– ঢাকাতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমার অজান্তেই ঘটিয়াছে। ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডারকে নির্দেশ দিয়াছি এটি প্রতিহত করার জন্য। তোমরা পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকো। আমার অফিসে অনুমান সকাল ৭টার সময় রেডিও ঘোষণার মাধ্যমে প্রথম বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার কথা শুনিয়াছি। আমি অফিসে অবস্থানের সময় আমার ডেপুটি চিফও আমার সামনেই বসিয়া ছিলেন। একপর্যায়ে ডেপুটি চিফ জেনারেল জিয়া বলিলেন, 'সিজিএস খালেদ মোশাররফকে আর বাহিরে যাইতে দিও না। তাহাকে বলো ops order (Ops অর্থাৎ অপারেশন বা অভিযান) তৈরি করিতে। কারণ ইন্ডিয়ান আর্মি মাইট গেট ইন।' আমি বলি, ঠিক আছে, আমি দেখব। এই সময় খালেদ মোশাররফ ফিরিয়া আসে এবং আমার অফিসে ৪৬ ব্রিগেডের ঘটনা বলার কথা বলিতে যাবে– এমন সময় বাহিরে হট্টগোলের

আওয়াজ শুনি। তখন আমার অফিসে জেনারেল জিয়া, আমার মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল নাসিম এবং সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ উপস্থিত ছিল। এ সময় বাহিরে দরজা ধাক্কা দিয়া মেজর ডালিম ১০-১৫ জন সৈন্যসহ সশস্ত্র অবস্থায় আমার অফিসে ঢুকে এবং তাহাদের অস্ত্র আমার দিকে তাক করিয়া দাঁড়ায়। ডালিম যদিও একজন চাকরিচ্যুত অফিসার ছিল, সেইদিন সে ইউনিফর্ম পরিহিত ছিল। আমি ডালিমকে উদ্দেশ করিয়া বলি, ডালিম আমি এই অস্ত্র দেখে এবং ব্যবহারে অভ্যস্ত, তুমি যদি এটা ব্যবহার করিতে আসিয়া থাকো, তাহা হইলে ব্যবহার করো। আর তাহা না হইলে যদি কথা বলিতে আসিয়া থাকো, তাহা হইলে তোমাদের সৈন্যদের অস্ত্র বাহিরে রাখিয়া আসো। ইহার পর তাহার অস্ত্রটি নিচের দিকে মুখ করিয়া বলে, 'Sir President wants you in the radio station.' আমি তখন বলিলাম, President তো মারা গেছেন। তখন সে আমাকে বলিল, 'Sir you should know Khondakar Mustaque is the President now.' তখন আমি বলি, Khondakar Mustaque may be your President, is not mine. ডালিম বলে, 'Sir don't make me do something for which I did not come.' আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার যাহা খুশি করিতে পার। আমি আমার troops-এর কাছে যাইতেছি। এই কথা বলিয়া আমি আমার অফিস হইতে বাহির হইয়া আসি এবং ৪৬ ব্রিগেডে রওয়ানা করি। ডালিম তাহার সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত গাড়ি নিয়া আমার পেছনে পেছনে আসিতে থাকে এবং ৪৬ ব্রিগেডে একটা ইউনিটে নিয়া যায়। সেখানে মেজর রশিদ এবং মেজর হাফিজ আমাকে রেডিও স্টেশনে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। ওইখানের পরিবেশ দেখে আমি হতভম্ব হইয়া যাই এবং তাহাদের চাপের মুখে আমি যে, আমি একা যাইব না। আমি এয়ার এবং নেভাল চিফের সাথে কথা বলি। কিছুক্ষণ পরে তাহারা আমার কাছে আসিলেন। আমি তখন কী করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। কোনো কাউন্টার অ্যাকশনে রক্তপাত এবং সিভিল ওয়ার হইতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতি ধারণা করিয়া এবং মেজর রশিদ ও মেজর ডালিমের চাপের মুখে আমিও রেডিও স্টেশনে যাইতে বাধ্য হই। আমি রুমে ঢুকার সাথে সাথে খন্দকার মোশতাক আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'Congratulation Shafiullah. Your troops have done an excellent job. Do the rest.' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, What rest you should know it better. আমি বলিলাম, In that case leave it me. এই কথা বলিয়া আমি রুম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলাম। এমতাবস্থায় তাহেরউদ্দিন ঠাকুর সাহেব বলিল, 'স্যার ওনাকে থামান। ওনার আরও দরকার আছে।' এই কথা বলার সাথে সাথে ডালিম, রশিদ ও অপর একজন, সম্ভবত মোসলেম, আমাকে আটকিয়ে ভিন্ন রুমে নিয়া যায়। ওই রুমে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর সাহেব আসেন এবং আমাকে আনুগত্য স্বীকারের একটা খসড়া লিখিয়া দেন এবং ওই খসড়ায় আমাকে দিয়া পড়াইয়া আমার কণ্ঠে রেকর্ড করানো হয়। তারপর আমাদেরকে বঙ্গভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শপথ পড়ান। আমি তখন ওই কনফারেন্স রুমে গিয়া সেখানে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং সম্ভবত বরিশালের নুরুল ইসলাম মঞ্জুসহ আর্মির কিছু অফিসার (যাহারা প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠানে ছিল) উপস্থিত ছিল। ওই সময় খন্দকার মোশতাক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, শাহ মোয়াজ্জেম এবং ওবায়দুর রহমানকে একই সুরে কথা বলিতে দেখিয়াছি। আরও দেখিয়াছি খন্দকার মোশতাক বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের সূর্যসেনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই কয়দিন ডেপুটি চিফ জিয়া, শাহ মোয়াজ্জেম, ওবায়দুর রহমানকে বঙ্গভবনে আসা-যাওয়া করিতে দেখিয়াছি। ১৯ তারিখ আমি Formation কমান্ডারদের একটি কনফারেন্স ডাকি। ওইদিন কনফারেন্স শুরু হওয়ার আগে আমার এডিসি জানায় যে, ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সাফায়েত জামিল আমার সাথে দেখা করিতে চায়। আমি অনুমতি দিলে সাফায়েত তাহার ব্রিগেড মেজর হাফিজকে নিয়ে আমার রুমে ঢোকে এবং বসতে বসতে বলে, 'Sir don't trust your deputy. He is behind all these things.'

> "গাড়ি থামিলে রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলী, এলডি মৃধা এবং অন্যরা রাস্তার ডানদিকে রাস্তার পাশে দোতলা একটি বাড়িতে ওঠে। আমি আমার জিপের পাশে দাঁড়ানো ছিলাম। একটু পরেই দোতলায় গুলির আওয়াজ পাই

আমি তাহাকে বলিলাম, এই কথাগুলো বলিতে তোমার এত সময় লাগিল? (সাফায়েত কোনো উত্তর দিয়া বলিল Killers must be punished.) আমি তাহাকে বলিলাম, আজকের কনফারেন্স সেই জন্য। একবার তাহারা চেইন অব কমান্ডে আসিলে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারিব। ওই কনফারেন্সে মেজর রশিদ ও ফারুকও আসে। এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিল শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অফিসারদেরকে সেনানিবাসে ফেরত আনা। ফেরত আনার উদ্দেশ্যে আমি কৌশলগতভাবে বলি যে, India might attack Bangladesh. আমাদের এটা প্রতিহত করিতে হইবে। সেই ব্রিফিংয়ের দরকার আছে। একপর্যায়ে সাফায়েত জামিল মেজর রশিদ ও ফারুককে লক্ষ করিয়া বলিল, 'They must be court martialed.' ইহাতে আমি দেখি তাহাদের মুখ মলিন হইয়া যায়। তাহাতে আমার মনে হইল আমার কনফারেন্স ডাকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।"

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণে এটি পরিষ্কার যে, প্রত্যক্ষ খুনিদের মদতদাতা হিসেবে নেপথ্যে একটি ষড়যন্ত্রকারী মহল ক্রিয়াশীল ছিল। প্রত্যক্ষ খুনিদের বিচারকার্য সম্পন্ন করে জাতি কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়েছে ঠিক; কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের আনুষ্ঠানিক দায় ও মুখোশ এখনো উন্মোচিত হয়নি। ইতিহাস সাক্ষী দেয়– ষড়যন্ত্র একটি চলমান বিষয়। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত ষড়যন্ত্রীরা যদি আড়ালে থেকে যায় তবে তাদের উত্তরসূরিরা নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বুনতেই থাকবে। যে কোনো মুহূর্তে আবার রক্তাক্ত হবে বাংলাদেশ। আজ এ কথা স্পষ্ট করে বলতে হবে, কেবল প্রত্যক্ষ খুনিদের বিচার ও সাজা বাস্তবায়নই যথেষ্ট নয়। একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে আড়ালে থাকা এই ষড়যন্ত্রকারীদের আলোয় আনতে হবে। নয়তো ইতিহাস আমাদের দায়মুক্তি দেবে না।

**লেখক: অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, আপিল বিভাগ**

# দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়েই তিনি জাতির পিতা

মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া

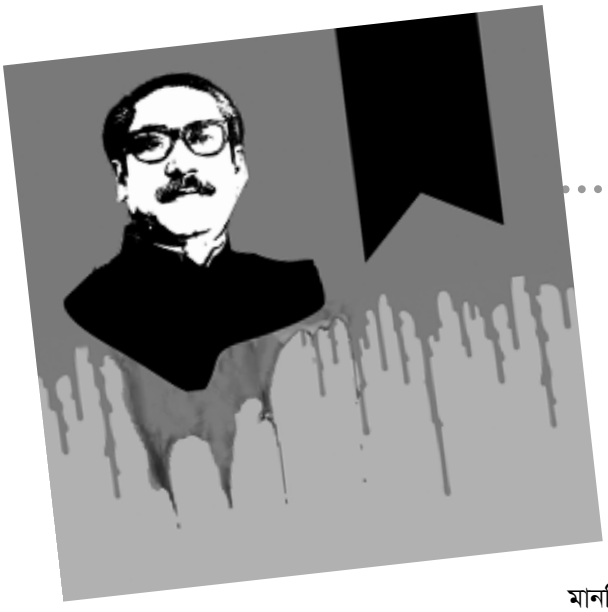

ছাত্রজীবন থেকেই অধিকার আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। গোপালগঞ্জের এক অজপাড়াগাঁয়ে জন্ম এই মহামানব মানুষের অধিকার-সচেতন ছিলেন সব সময়। অর্থের প্রাচুর্য না থাকলেও শৌর্য, সৌম্য ও মানবিকতায় তিনি ছিলেন অনন্য।

দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়েই তিনি বঙ্গবন্ধু হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর নামের ওপরই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। আমরা তাঁর আহ্বানেই জীবনবাজি রেখে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করেছি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুক্তিসংগ্রাম যেভাবে সংঘটিত হয়েছিল, আমরাও সেভাবে মরণপণ লড়াই করেছি। দক্ষিণ আফ্রিকার জীবন্ত কিংবদন্তি নেলসন ম্যান্ডেলা দীর্ঘ ২৭ বছর কারাবাসে ছিলেন। সে দেশের কৃষ্ণাঙ্গরা তাঁর নামেই শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেছিল। ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্নোর সংগ্রামী জীবনের চিত্র। ভিয়েতনামের হো চি মিন এবং তুরস্কের কথা ভাবলেই কামাল আতাতুর্কের কথা এসে যায়। আলজেরিয়া আর চিলির আন্দোলন-সংগ্রামের সঙ্গে মিশে আছে বেনবেল্লা ও আলেন্দের নাম। এটাই ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারা। ইতিহাসে এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে। আসলে বিশ্বের যে কোনো জাতির মুক্তিসংগ্রামের নেতা একজনই। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। দীর্ঘ আপসহীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিরঙ্কুশ জনসমর্থন এবং সর্বোপরি জাতির ক্রান্তিলগ্নে ঐতিহাসিক দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিণত হয়েছিলেন এ জাতির অবিসংবাদিত নেতায়।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তি তথা এই স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনামলের ১৩ বছরই কারাগারে ছিলেন।

বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপস করেননি তিনি। এমনকি পাকিস্তানে বন্দি থাকাকালে তাঁর নামে ও নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। তাঁর নামের ওপরই এদেশের অসংখ্য মানুষ মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও লড়াই করেছে। সব শ্রেণিপেশার লোক এক কাতারে দাঁড়িয়েছে। এভাবেই ইতিহাসে নির্ধারিত হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান।

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। এ সাড়ে তিন বছরে তিনি তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ নেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে আসেন। সদ্যস্বাধীন দেশের সরকার পরিচালনার তিনি দায়িত্ব নেন। দেশ তখন ছিল একটি ধ্বংসস্তূপ। রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ভাঙা, রেল যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন, সমুদ্রবন্দরগুলো অকেজো, কলকারখানা অচল, খাদ্যগুদামগুলো খালি এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল শূন্য। দেশে কোনো বেসামরিক বিমান সংস্থা ছিল না, শিপিং করপোরেশনের কোনো সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল না। এ রকম নাজুক পরিস্থিতিতে তাঁর সামনে প্রথম ও বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল প্রায় তিন কোটি ছিন্নমূল মানুষের গৃহনির্মাণ, খাদ্যসংস্থান করে পুনর্বাসন করা। এরপর ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, উৎপাদন ব্যবস্থার পুনর্গঠন, বহির্বিশ্বের স্বীকৃতি আদায়, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সদস্যপদ লাভ এবং পাকিস্তানে আটকে থাকা অসংখ্য বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে আনা। বঙ্গবন্ধু শুরুতেই একটি শোষণহীন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। সেই ধারাবাহিকতায় কাজও শুরু করেছিলেন। কিন্তু শুরুতেই তিনি অপপ্রচার তথা ষড়যন্ত্রের শিকার হন। এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। তাঁর হাতে গড়া বাংলাদেশ ছাত্রলীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়। এর একটি অংশ রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে তার প্রবল বিরোধিতায় নামে। এরই সুযোগ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দলগুলো ভেতরে ভেতরে সশস্ত্র ও নাশকতামূলক তৎপরতা শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের সহায়তাকারী দালাল, রাজাকার, আলবদর, আলশামসরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা সফল হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। অথচ সেসময় যুদ্ধবিধ্বস্ত এ দেশকে পুনর্গঠন করা একমাত্র বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। শূন্য কোষাগার নিয়ে বঙ্গবন্ধুর মতো আর কোনো সদ্যস্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে দেশের হাল ধরতে হয়নি। বহির্বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর ইমেজ ও তাঁর অসাধারণ ক্যারিশমা এবং জনসাধারণের ওপর তাঁর তুলনাহীন আস্থা ও বিশ্বাস বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তাঁকে সহায়তা করছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট মেরামত করে যোগাযোগব্যবস্থা আবার চালু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর হাত দিয়েই বাংলাদেশে নিজস্ব বিমান সংস্থা, নিজস্ব বাণিজ্যিক জাহাজ যাত্রা শুরু করে। সেনাবাহিনীর পাশাপাশি গড়ে ওঠে নৌ ও বিমানবাহিনী। থানা ও পুলিশ বিভাগের ৮০ ভাগই পাকিস্তানিরা ধ্বংস করেছিল। সেগুলো পুনর্গঠন করা হয়। যদ্দূর জানি, তাঁর ব্যক্তি ইমেজে তিনি ইরান থেকে বিনা পয়সায় তেল আনেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাশিয়া থেকে ট্রাক্টর নিয়ে আসেন। রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন অপসারণ করে তা ব্যবহার উপযোগী করেছিলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ তার দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্যোগী হন। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তিনি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে মওকুফ তাঁর আমলেই হয়। ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উৎপাদনে সম্পৃক্ত করে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে সমবায় খামার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছিলেন বলেই মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর কাছে অস্ত্রসমর্পণ করেছিল। বঙ্গবন্ধু যদি নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের হাল না ধরতেন, তাহলে দেশে নানা সংকট বিরাজ করত। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং পাকিস্তানিদের দোসর স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র প্রতিশোধ গ্রহণ শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি দোসর ও অবাঙালি বিহারিদের ওপর প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠলে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় অবস্থানের কারণে দ্রুত তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। কারণ, তিনি প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন না। চাকরিসূত্রে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বাহাত্তর সালের প্রথমদিকে খুলনায় বিহারি অধ্যুষিত অঞ্চলে দায়িত্ব পালনের। বঙ্গবন্ধু নিজে গিয়ে এসব দাঙ্গাকবলিত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আরেকটি বড়ো সাফল্য ছিল– স্বাধীনতার স্বল্পসময়ের মধ্যে ১৯৭২ সালে জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দেওয়া। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই সংবিধানের মূলনীতি। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার এই সংবিধানে সংরক্ষিত হয়েছিল। সংবিধানের মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে তিনি একটি শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ছেঁটে ফেলা হয়।

মাত্র সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্র পরিচালনার সময় পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সদ্যস্বাধীন একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত ও সমস্যাসংকুল দেশকে পুনর্গঠনের জন্য এটা যথেষ্ট সময় নয়। এ স্বল্পসময়ে তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তাঁর সব কর্মকাণ্ড জনগণের কল্যাণে পরিচালিত হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সব ধরনের দুর্নীতি, লোভ-লালসা ও ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে ছিলেন। বাংলাদেশের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, দুঃখী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের কল্যাণসাধনই তাঁর কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল।

দোষেগুণে মানুষ। শাসক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ডের আলোচনার পাশাপাশি সমালোচনাও করেন কেউ কেউ। তবে এসব সমালোচনায় অপপ্রচারটাই বেশি। যে অবস্থান থেকে একটি সদ্যস্বাধীন দেশকে বঙ্গবন্ধু গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন– যদি বাধা না পেতেন, ষড়যন্ত্রের জালে না পড়তেন, শত্রুপক্ষের অরাজকতায় না পড়তেন– এতদিনে বাংলাদেশ মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের পর্যায়ে চলে যেত। বঙ্গবন্ধুর ভালো-মন্দ দিকগুলো ইতিহাস মূল্যায়ন করবে। ইতিহাস চাপিয়ে দেওয়ার বা জোর করে ধারণ করার বিষয় নয়। পঁচাত্তরের পর বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে মুছে দিতে নানা অপপ্রচার হয়েছিল। এ লক্ষ্যে সংবিধানেও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে অবৈধ, নগ্ন হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে মিথ্যা তথ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু তাদের শেষরক্ষা হয়নি। ইতিহাস তার নিজের গতিতে চলেছে এবং চলছে। ইতিহাসই পিতা মুজিবের অবস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই দেশ যতদিন টিকে থাকবে, বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধুও মানুষের হৃদয়ে থাকবেন। কারণ তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়, বাংলাদেশ নামক দেশটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

**লেখক: সংসদ সদস্য; সভাপতি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি**

# বঙ্গবন্ধু জনগণের কাছে থেকেছেন আজীবন

## —মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি। স্কুলজীবনে স্কাউটসহ নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। 'আসিয়া' চলচ্চিত্রে কিশোর চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন। ১৯৬৬ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে মিছিল করতে গিয়ে কারাবরণ করেন, তখন তিনি স্কুলছাত্র। কলেজে পা দিয়েই বামধারার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সকালে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন, তাই অভ্যর্থনার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন কদিন আগে থেকেই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আসেননি, এসেছে তাঁর মৃত্যুর খবর।

বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর যে কয়টা প্রতিবাদ বা মিছিল হয়েছিল, তার শুরুটা ছিল ডাকসু থেকে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর প্রথম প্রতিবাদ মিছিল হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যার অন্যতম নেতৃত্বে ছিলেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। সেই সময়কার ঘটনাপ্রবাহের কিছু বর্ণনা তিনি তুলে ধরেছেন তার সাক্ষাৎকারে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন– **বনশ্রী ডলি**

**প্রশ্ন:** ১৯৭৫ সালে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল, অভ্যর্থনার প্রস্তুতি

নিয়ে অপেক্ষায়ও ছিলেন– তিনি আসেননি, এসেছে তাঁর মৃত্যুর খবর, রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে– এমন খবর। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবরে সেসময়ের পরিস্থিতি কেমন হয়েছিল, কী করেছিলেন সেদিন?

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমঃ** ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল। আমি তখন ডাকসুর ভিপি হিসেবে দায়িত্বরত। রাষ্ট্রপ্রধানের আসা উপলক্ষ্যে স্বাভাবিকভাবেই কদিন ধরে প্রস্তুতি চলছিল। আমাদের প্রস্তুতিতে কোনো ত্রুটি যেন না থাকে, সেদিকে সজাগ ছিলাম। তারপরও আগের দিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কে বা কারা দু-তিনটা ককটেল ও গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটাল। সতর্ক হয়ে গেলাম। শামসুন্নাহার হলের গেটে একটা পাকিস্তানি পতাকা কে যেন আঠা দিয়ে আটকে রেখে গেছে খবর পেলাম। এতে আরও সতর্ক হলাম। সব সিকিউরিটিকে খবর দিলাম। আমাদের ভলান্টিয়ার গ্রুপ মোটরসাইকেলে রাউন্ড দিল পুরো এলাকা। একেবারে 'আনইন্টারাপটেড', পুরো ক্যাম্পাসের 'সিকিউরিটি চেক' করার ব্যবস্থা তো তখন নেই। সেই রাতে আমরা প্রায় সব নেতাকর্মী বিশ্ববিদ্যালয়েই কাটিয়েছি। বঙ্গবন্ধুর ছেলে শেখ কামাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমাদের সঙ্গে আয়োজনে কাজ করছিল। রাত দেড়টার দিকে কামাল বলে, সেলিম ভাই আমি বাসায় যাই। কাল সকালে আসব। আপনারা তো আছেনই। কদিন আগে বিয়ে করেছে কামাল। সেটা ভেবে মনটা আমার নরম হয়ে গেল। বললাম, বাসায় যাবে যাও, তবে কাল সকাল সকাল চলে আসবে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের মোটরবহরের সঙ্গে নয়; আগে এসে গ্রুপে যুক্ত হতে হবে। সেদিন যদি আমার মনটা নরম না হতো, কামাল বাসায় না যেত সেই রাতে, তাহলে হয়তো শেখ কামাল বেঁচে যেত! এটা এখনো মনে খচখচ করে। আমার জুনিয়র ছিল শেখ কামাল। তবে সুসম্পর্ক ছিল আমাদের।

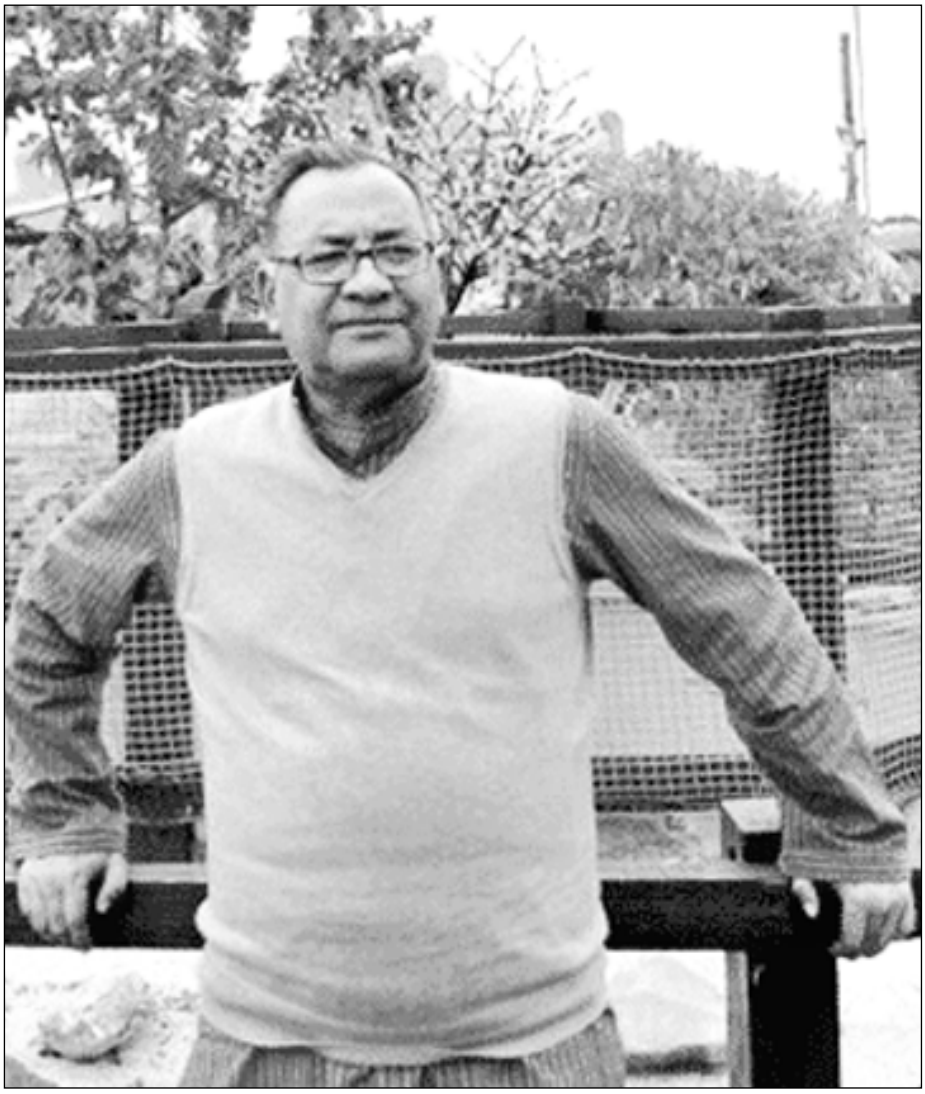

ছবি: ইন্টারনেট

১৫ আগস্টের আগে বঙ্গবন্ধু জানতেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তবে তাঁকে হত্যা করবে, এটা তিনি ভাবতে পারেননি। তখনকার কিছুটা অস্থির পরিস্থিতি ও সতর্কবার্তা জানার পরও ৩২ নম্বরের বাড়িসহ কোথাও সিকিউরিটি খুব কড়া ছিল না। বাইরে গেলেও সিকিউরিটি কিছুটা 'ল্যাপস' ছিল। এর একটা উদাহরণ দিই। স্বাধীনতার পর ছাত্র ইউনিয়নের দুটি সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন। একবার সম্মেলন উদ্বোধন শেষে সেখানে ছবির যে 'এক্সিবিশন' হতো, তা তিনি ঘুরে দেখছেন। ফটোগ্রাফার পাভেল রহমান একটা ছবি তুলেছেন, ছবিতে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু 'এক্সিবিশনের' একটা ছবি দেখছেন মন দিয়ে আর ওনার পায়ের কাছে পর্দা সরিয়ে কয়েকজন পথশিশু যাদের টোকাই বলা হতো তারা বঙ্গবন্ধুকে গলা বাড়িয়ে দেখছে। এক অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করেছে পাভেল। এই ছিল বঙ্গবন্ধুর সিকিউরিটির অবস্থা। তিনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন কম। সব সময় ভাবতেন তিনি তো জনগণের নেতা, তার ক্ষতি কেউ করবে না, এত নিরাপত্তার দরকার নেই।

**প্রশ্নঃ** বঙ্গবন্ধু হত্যা ও পরের পরিস্থিতি সম্পর্কে...

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমঃ** আগের রাতে সারারাত জেগেই ছিলাম, ১৫ আগস্ট সকালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে থমথমে অবস্থা। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে পালিয়ে যাওয়া বা চুপ করে বসে থাকার প্রশ্নই আসে না। সকালেই সব জায়গায় খবর দিই, যেভাবেই হোক প্রতিবাদ মিছিল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে দুপুর পর্যন্ত বসে আছি। একের পর এক খবর আসছে। দেখি সেনাবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধান, বিমানবাহিনীর প্রধান খন্দকার মোশতাকের আনুগত্য স্বীকার করছে। শুধু তা-ই নয়, পুরোনো মন্ত্রিসভার প্রায় সবাই মোশতাকের ক্যাবিনেটে যোগ দিয়ে শপথ নিচ্ছে। তখন বুঝলাম, তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ততক্ষণে বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে প্রতিবাদের জন্য। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের

কর্মীদের ঘরে ঘরে গিয়ে খুঁজে বের করতে হয়েছে। বেশির ভাগই আসতে চায়নি। অনেকেই সেদিন দুই নৌকায় পা রেখে চলেছে। সেদিন যাদের পেয়েছি, তাদের নিয়েই তাৎক্ষণিক কর্মসূচি ঘোষণা করলাম– ৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩২ নম্বরে গিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হবে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে ১৯৭৫ সালের ১৮ বা ১৯ অক্টোবর। আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম যে, এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঝটিকা মিছিল করতে হবে। অন্যদের বুঝতে দেওয়া যাবে না। স্লোগান হবে– 'এক মুজিবের রক্ত থেকে লক্ষ মুজিব জন্ম নেবে, শেখ মুজিবের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।'

সেদিন মিছিল করার জন্য মধুর ক্যান্টিনের সামনের জায়গাটায় বেশ কজন জড়ো হয়। পেছন থেকে আমি মনিটরিং করছিলাম। কয়েকজনের নাম মনে আছে– ছাত্র ইউনিয়নের কাজী আকরাম, মাহবুব জামান এবং কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীসহ বেশ কজন মিছিলে ছিল সেদিন, 'কাঁদো দেশবাসী কাঁদো' এই শিরোনাম দিয়ে লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করতে গিয়ে অনেকে গ্রেফতারও হলো। প্রতিবাদে শামিল হওয়ার জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কবি জসীমউদ্‌দীনের কাছে গিয়েছিলাম। তারা বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে আছি; কিন্তু শারীরিকভাবে তো মিছিল করতে পারব না।' মিছিল করার সময় আওয়ামী লীগের নেতারা মিছিল করতে বারণ করলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, বঙ্গবন্ধুকে তো ফিরে পাওয়া যাবে না, মাঝখান থেকে আওয়ামী লীগ সরকারকে বাতিল করা হবে। এর অর্থ তারা তখন মোশতাকের সরকারকে আওয়ামী লীগের সরকার বলছেন। তাদের সবার নাম মনে নেই, তবে শাহ মোয়াজ্জেম, ওবায়দুর রহমানের নাম মনে আছে। আমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না; কিন্তু তারা খবর পাঠাচ্ছেন। তখন তো অর্ধেক আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন অনেকে। প্রতিবাদ জানানোর জন্যও সেদিন অনেককে খুঁজে পাওয়া যায়নি আর এখন লাখ লাখ মানুষের ভিড়। প্রায় সবাই শেখ মুজিবের নামে বন্দনা করে; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মর্মবাণী ধারণ করে কজন, সেটাই ভাবনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের বাণী ধার করে বলি, 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি'। আসলে বঙ্গবন্ধুকে জানা ও বোঝার চেষ্টা তো দেখি না! প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলেছিলাম, এখনো বলছি, বঙ্গবন্ধুর নামে বক্তৃতা ও বন্দনা পাঁচ বছরের জন্য বন্ধ করে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতাগুলো শোনানো হোক নতুন প্রজন্মকে। বঙ্গবন্ধুকে নিজের স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেক সময় পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে।

অতি বন্দনা, অতি ভক্তি যারা করে, তারা কত ভয়ংকর এর একটা উদাহরণ দিই। খন্দকার মোশতাক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অতি ভক্ত। বঙ্গবন্ধুর বাবা যেদিন মারা গেলেন, তখন ক্যাবিনেট মিটিং করছেন বঙ্গবন্ধু। খবর পেয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন এবং বললেন, 'কারও যাওয়ার দরকার নেই মিটিং চলুক।' সেদিন অন্যরা যাননি; কিন্তু মোশতাক কোন ফাঁকে বেরিয়ে বঙ্গবন্ধুর হেলিকপ্টারে উঠে গেলেন, হয়তো কারও নজরে আসেনি। বঙ্গবন্ধুর বাবার মরদেহ কবরে নামানোর পর গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে শোক প্রকাশ করেছিলেন মোশতাক, তা টেলিভিশনে দেখেছে সবাই। এর কিছুদিন পরেই ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটাল মোশতাকরা।

**প্রশ্ন:** ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হওয়ার পর দেখা করতে গেলেন, কী পরামর্শ ছিল আপনার প্রতি বঙ্গবন্ধুর?

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম:** বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পর তিনি মূলত আমাদের কথাই বেশি শুনলেন। আমরা আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে বললাম। ডাকসু করা হয়েছে, সেখান থেকে সমাজতন্ত্রের কারিকর তৈরির কারখানা হবে। ডাকসুর তৈরি প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি কুদরত-ই-খোদার শিক্ষা কমিশনে পাঠানো হবে এবং তিনি যেন তা দেখেন, অনুরোধ জানাই। শুনে তিনি খুব উৎফুল্ল হলেন, চোখে-মুখে এক উজ্জ্বল আভা দেখেছি, যা ছিল আমাদের জন্য প্রেরণা। আমাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ দিলেন। বললেন, 'তোমরা এই কাজগুলো করে যাও। আমি সমাজতন্ত্র আনবই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখ।'

**প্রশ্ন:** বঙ্গবন্ধুর বিশেষত্ব কোথায়?

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম:** বঙ্গবন্ধুর বিশেষত্ব অনেক। এই প্রসঙ্গে একটা বড়ো ঘটনার কথা মনে পড়ছে, ১৯৭৩ সালের পহেলা জানুয়ারি। ভিয়েতনাম সংহতি দিবসে পল্টনে সংহতি জানাতে আসা ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালায় পুলিশ। তখন মার্কিন তথ্যকেন্দ্র ইউএস আইএস অফিস ছিল প্রেস ক্লাবের বিপরীত দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ সেদিন বিনা উসকানিতেই আমাদের মিছিলে গুলি করে। ছাত্র মতিউল ইসলাম ও মির্জা আবদুল কাদের শহিদ হন, আহত হন আরও অনেকে। আমিও ছিলাম সেই মিছিলে। আমার কাঁধেও সেদিন পুলিশের বাঁটের আঘাত লেগেছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কিন্তু ঘটনার পর সরকারি প্রেস রিলিজে এই ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় ছাত্রদের। তখন তো ছাত্ররা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। সেই পরিস্থিতিতে জনগণের কাছে বিচার চাওয়ার মতো করে আমরা বলছিলাম, সন্তানতুল্য ছাত্রদের রক্তে যার হাত রঞ্জিত হয়েছে তাঁকে জাতির পিতা বলবেন না। বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ স্থগিত করা হলো। সেদিন সিদ্ধান্ত ছিল বঙ্গবন্ধুর নামটা কেটে দেওয়া হবে; কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে উত্তেজনাবশত আরেক ছাত্রনেতা কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে। এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ সারাদেশে প্রচণ্ড মারমুখী হয়ে পড়ে। ঢাকা মেডিকেলের মর্গ থেকে এক ছিনতাইকারীর লাশ এনে মিছিল করতে থাকে এবং প্রচার করে ছাত্র ইউনিয়নের গুন্ডাদের হাতে এই ব্যক্তি নিহত হয়েছে। তা সত্যি ছিল না, পরে মেডিকেল থেকে এই ব্যক্তির এক্সরে রিপোর্ট জোগাড় করে দেখা গেল, সে ছিল ছিনতাইকারী বা হাইজ্যাকার। সম্ভবত লাশের ব্যক্তিটির নাম ছিল মীর জাহান। পরিস্থিতি যখন আরও খারাপের দিকে যাওয়ার আশঙ্কা, তখন বঙ্গবন্ধু আন্দোলনরত ছাত্রদের প্রায় সব দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নানকে সরিয়ে দেন। একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করা হয়। দাবি অনুযায়ী ইউএনআইএস-এর অফিস বন্ধ করে দেন। সেই অফিসের সাইনবোর্ড মুছে দিয়ে সেটা মতিউল কাদের পাঠাগার লিখে দিয়েছিলাম। মনে পড়ে, আমিই সেই ভবনে উঠে আমেরিকার পতাকা নামিয়ে ভিয়েতনামের পতাকা উড়িয়েছিলাম। ওই আন্দোলনের পটভূমিতে ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু সরকার স্বীকৃতি দেয়। ভিয়েতনামকে বাংলাদেশে দূতাবাস খোলার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু এবং দূতাবাস খোলার সব খরচ বহন করবে বলে ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ সরকার। পুলিশের হামলায় আহতদের চিকিৎসার ভার নিল সরকার। আহত পরাগ মাহবুবকে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে পাঠান তিনি। তিনি সেসময়ের আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, পরিস্থিতি সামলাতে রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন অসাধারণ মানবিক গুণে। অপপ্রচার ছিল– মুজাহিদুল সেলিম আত্মসমর্পণ করেছিল। মোটেই তা নয়। বঙ্গবন্ধু দাবিগুলো মেনে নিয়েছিলেন। বামপন্থিদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের দূরত্ব বাড়ানোর একটা ষড়যন্ত্র চলছিল, বঙ্গবন্ধু সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। দাবিগুলো মেনে নেওয়ায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করি। তিনি আমাকে ৩২ নম্বরের

বাসায় যেতে বলেন। পরে একদিন ৩২ নম্বরের বাসায় যাই। বঙ্গবন্ধু আমাকে নিচের ঘর থেকে দোতলায় যেখানে বসে খেতেন, সেখানে নিয়ে বসতে বললেন, নিজেও বসলেন। বসেই ডাক দিলেন, 'কোথায় কামালের মা, আসো, তুমি না সেলিমকে দেখতে চেয়েছিলে। কুমিল্লার রসমালাই আছে, একটু নিয়া আসো।' এখনো মনে আছে, সেদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, 'শোনো, রাজনীতি করতে হলে অনেক সময় অনেক কথাই বলতে হয়।' জনগণকে শান্ত করতে বা পরিস্থিতি সামাল দিতে জনগণের সামনে অনেক কথাই বলার দরকার হয়, সেটা বোঝাতেই তিনি তা বলেছিলেন।

**প্রশ্ন:** এসব বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা না কৌশল? তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বা কৌশলের ফলে মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছে; কিন্তু স্বাধীনতার পরের বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কৌশল, বিশ্বাস তাঁকে বিপদে ফেলেছে বলা হয়, আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম:** এটা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নয়, এটা ছিল তাঁর রাজনৈতিক কৌশল। মুক্তিযুদ্ধের আগে আর পরের পরিস্থিতির মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। সেটা সামাল দিতে গিয়ে তাঁর কৌশলগুলো কিছু সফল হলেও আড়ালে চলছিল ভয়ংকর কিছু। মানুষের প্রতি তাঁর অতিবিশ্বাস আর উদারতার রাজনীতি ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটানো সহজ হয়েছে বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে। ১৫ আগস্টের কয়েক দিন আগের কথা, একদিন তাঁর কাছে গেলাম, এমন মাঝেমধ্যেই যেতাম। দেখেই বললেন, 'তোমার নেতারা আসছিলেন আমাকে সাবধান করতে, সতর্ক করতে আসছিলেন তারা। আমি কি বলেছি জানো, দাদা আপনাদের জন্য চিন্তা করছি, আপনারা সাবধানে থাকবেন। আরও বলেছি, কোনো বাঙালি আমাকে গুলি করতে পারবে না, হাত কাঁপবে।' পরে নেতাদের কাছেও শুনেছি, বঙ্গবন্ধু এমন কথা বলেছিলেন। এই ঘটনায় আমার বিশ্লেষণ হলো, তিনি ভেবেছিলেন তাঁকে কোনো বাঙালি গুলি করতে গেলে হাত কেঁপে যাবে, পারবে না। তিনি বাঙালি বুঝতেন, মোশতাকদের বুঝতেন না। বাঙালির ভেতর যে মোশতাক থাকতে পারে এবং সে যে কত ভয়ংকর হতে পারে! মোশতাক শ্রেণির বিশ্বাসঘাতকদের বঙ্গবন্ধুর মতো নেতাকে গুলি করতে হাত কাঁপবে না, সেটা ভাবতে চাননি। আমাকে বঙ্গবন্ধু একাধিকবার বলেছেন, 'এই মোশতাককে চিনে রাখ, যার মাথার ভেতরে খালি প্যাঁচ, খুব সাবধান থাকবা। এমন প্যাঁচ যে তার মাথার ভেতরে তারকাঁটা ঢুকিয়ে বের করলে দেখবা এটা স্ক্রু হয়ে বের হয়েছে, এত প্যাঁচ।' বলেছিলাম, এখনো তাকে রাখছেন কেন? আমাকে তুমি করে বলতেন, আমি মুজিব ভাই বলে ডাকতাম। তখন বললেন, 'ওকে কাছাকাছি রাখি, বগলতলায় রাখি, যাতে শয়তানি করতে না পারে।' কিন্তু কাছাকাছি থেকে মোশতাক কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল, এটা টের পাননি বা বিশ্বাস করেননি বঙ্গবন্ধু, এটা আজ বাঙালির কলঙ্কিত ইতিহাস!

> তখন তো অর্ধেক আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন অনেকে। প্রতিবাদ জানানোর জন্যও সেদিন অনেককে খুঁজে পাওয়া যায়নি আর এখন লাখ লাখ মানুষের ভিড়। প্রায় সবাই শেখ মুজিবের নামে বন্দনা করে; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মর্মবাণী ধারণ করে কজন

**প্রশ্ন:** বঙ্গবন্ধু তো বাঙালির ইতিহাসেরও নেতা?

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম:** এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের স্রষ্টা আবার ইতিহাসের সৃষ্টিও বটে। ইতিহাস শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু করেছে। এটা বুঝতে হবে। তিনি মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন, সেখান থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উন্নীত হলেন। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয়, কোনো ব্যক্তি শেষবিচারে তার দলের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না। দল তার শ্রেণির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। এটা হলো সাধারণ হিসাব। অনেক সময়ই বঙ্গবন্ধু এই নিয়মের মধ্যে ছিলেন, অতিক্রম করতে পারেননি। তবে এ কথাও সত্য– তাঁর অন্তরে অন্তর্নিহিত জনগণের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসা ছিল। তাঁকে একদিকে টানছে তাঁর দল ও শ্রেণি, আরেকদিকে টানছে জনগণ– এ দোটানার ভেতরে সব সময় তাঁকে কাটাতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেকে সমালোচনাও করতে পারে; কিন্তু ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু জনগণের পক্ষ ত্যাগ করেননি। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব, এখানেই তাঁর মহত্ত্ব। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদের নেতা। নেতা তো যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ণীত হয়। তিনিও তাই। নেতা মানেই তার সীমাবদ্ধতা থাকবে না তা তো নয়। নেতা মানেই তার শ্রেণি থাকবে না, সেটা তো হতে পারে না। কারণ, তিনি মানুষ তো! তারপরও তিনি অন্যদের চেয়ে আলাদা ও বিশেষ।

তবে একটা কথা বলা দরকার। বঙ্গবন্ধুকে বড়ো প্রমাণ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সময় থেকে ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা করছেন যে– বাংলাদেশের ইতিহাস সবটাই বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস। এটা ঠিক নয়, এটা অনৈতিক ইতিহাস। আগের ইতিহাসকে অস্বীকার করার প্রবণতা যা বঙ্গবন্ধু করেননি বা ভাবেননি। আগের ইতিহাস বাদ দিলে তো শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু হতে পারতেন না। এই বাংলাদেশের ইতিহাস নির্মাণে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা যেমন আছে, তেমনই ভূমিকা রয়েছে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান, কমরেড মণি সিংহ, কমরেড মোজাফ্ফর আহমেদ, ইলা মিত্রের। এছাড়া আরও অনেকের ভূমিকা রয়েছে। সম্পূর্ণ বঙ্গবন্ধুকে মূল্যায়ন করতে হলে তাদের কথা ইতিহাসে থাকা দরকার। স্বাধীনতার পর মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে অনশন করছেন। বঙ্গবন্ধু সেখানে ছুটে গেছেন, পায়ে ধরে সালাম করেছেন। তাঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, তা কখনো বঙ্গবন্ধু অস্বীকার বা অসম্মান করেননি। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধু দলকে নিজের আয়ত্তে নিলেন। তাঁর মনে যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা ছিল, সেভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। এসব ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সত্যি হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুকে খণ্ডিত ইতিহাস দিয়ে স্তুতি করে বড়ো দেখানোর প্রয়োজন নেই। তিনি নিজের কৃতিত্বেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

**প্রশ্ন:** বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের নেতা, তিনি কি বহুমত ও পথ ধারণ করতেন? সেজন্য কি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এত দিক সামলে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন?

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম:** রাজনৈতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েছে। এর প্রমাণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সফলতা, নেতৃত্ব। বাংলাদেশ গড়ার চিন্তাচেতনা ও উদ্যোগে এর প্রতিফলন ছিল। বেঁচে থাকলে আরও হয়তো হতো। তখনকার বঙ্গবন্ধুর চিন্তার ইতিবাচক দিকগুলো এগিয়ে যেত না পেছাত, তা জল্পনাকল্পনা করতে চাই না। 'স্পেকুলেশনের' জায়গা থেকে বলতে পারি, দলগত পিছুটান থাকলেও জনগণের চাহিদার চৌম্বকশক্তি তাঁকে সব সময় টেনে নিয়ে গেছে জনগণেরই কাছে। অনেক সময় থমকে গেছেন, পিছু হটেছেন; কিন্তু 'আলটিমেটলি' জনতার দিকেই গেছেন। কারণ, তাঁর আগাগোড়া সবকিছু বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, সময় পেলে তিনি এগিয়ে যেতেন অনেক দূর।

আর বহুমত ও পথ নিয়ে এগিয়েছেন? এর দুটোই ঠিক। তিনি জানতেন কোনো একটি বিষয়ে সাহসী পদক্ষেপ নিতে গেলেও কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় না। তিনি অনেকের সঙ্গে কথা বলতেন এবং তাদের কথা শুনতেন। আমাকে তো তিনি বলতেন, 'সেলিম তোমাদের তো সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয় না। পলিট ব্যুরোর মিটিং ডেকে আলাপ করে দুই ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। তোমাদের একটা পলিট ব্যুরো; কিন্তু আমার তো একশটা পলিট ব্যুরো। একশজনের সাথে আলাদা করে আলাপ করতে হয়।' তো তিনি সবার সঙ্গে আলোচনা করে পরে নিজের সিদ্ধান্ত নিতেন। এটা ওনার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য দেখেছি। খুব সাহসী ছিলেন, ছোটো কথাও সাহস করে বলতেন। পাঞ্জাবির হাত গুটিয়ে নিয়ে বীরপুরুষের মতো করে বলতে পারতেন। মানুষ সাহসী নেতৃত্বকে খোঁজে, ভরসা করে এবং তার পেছনে শামিল হয়। বঙ্গবন্ধুর ওপর সেজন্যই মানুষের ভরসা ছিল।

**প্রশ্ন:** তাঁর সাহসিকতা আর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্যই কি ছয় দফার পক্ষে তিনি জনমত গঠনে সফল হতে পেরেছিলেন, যা বামপন্থিরা পারেননি?

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম:** তিনি ছয় দফার দাবিগুলো মানুষকে খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করে সাধারণের বোধগম্য করে বক্তৃতা করেছেন সারা দেশে। এর আগের বছরগুলোয় আওয়ামী লীগ বলেছে স্বায়ত্তশাসন দরকার নেই; কিন্তু বামপন্থিরা বক্তৃতা করে বেড়িয়েছে যে পূর্ব বাংলার অধিকার দিতে হবে, তখন বঙ্গবন্ধু কিছু বলতেন না। বেশ কিছুদিন স্বায়ত্তশাসনের কথা শুনেছে জনগণ। মাঠে নামার মতো গণমানসিকতা বা অধিকারের বোধ তৈরি হতে সময় লেগেছে। কিছুদিন পর পরিস্থিতির মাত্রা বঙ্গবন্ধু ছয় দফা আর স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে জনগণকে আন্দোলনমুখী করতে পেরেছিলেন। একদিকে তাঁর নিজস্ব দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও গুণাবলির ফলে তা সফল হয়েছে। অন্যদিকে পরিস্থিতিটা এমন হয় যে, বামপন্থিরা চীন ও রাশিয়াপন্থিতে ভাগ হয়ে যায়। তখন চীনপন্থিরা 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব খান'– এমন একটি তত্ত্বের মধ্যে চলে গেল। অনেকে ভুলে যায়, এর আগে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উচ্চারিত হয়। চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের ২১ দফা দাবিতেও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিল। সেখানেও ছিল পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও মুদ্রা ছাড়া বাকি সব ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের হাতে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফাকে মানুষের কাছে নিয়ে গেলেন উপযুক্ত সময়ে দৃঢ়ভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নতুনভাবে ছয় দফায় রূপান্তরিত করে। পাকিস্তানের মুদ্রার ক্ষেত্রে দাবি ছিল, পূর্ববঙ্গের জন্য আলাদা মুদ্রা, নয়তো এক মুদ্রা থাকলে পূর্ববঙ্গের জন্য আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। এটাও ঠিক, এই দাবিগুলো আদায়ে অনড় হতে পেরেছেন তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর। বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনা আর বোধের মধ্যে যা ছিল, তা তিনি সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর করতে পেরেছেন। ওই যে উপযুক্ত সময় বুঝে করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিচক্ষণতা অনেক নেতারই ছিল না বা দেখাতে পারেননি। এটা তাঁর দূরদর্শিতা, এখানেই বঙ্গবন্ধুর বিশেষত্ব।

আরেকটি বিষয় বলা দরকার। স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন অনেক আগে থেকে, যখন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বা কবে হবে, এর ধারণাও কেউ করতে পারেনি। সেসময়ে আইয়ুবের প্রবল মার্শাল ল চলছে, ১৯৬১ সালের অক্টোবর বা নভেম্বর দিকের ঘটনা। আত্মগোপনে থাকা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড মণি সিংহ, খোকা রায় ও আরও কজনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দুই-তিনটি গোপন বৈঠক হয়। বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তখনকার পরিস্থিতি ও ভোটাধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা ও বন্দিমুক্তিসহ আরও কিছু বিষয়ে করণীয় কী। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে আন্দোলন করতে হবে। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ এই আন্দোলন করবে। সভা শেষে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'দাদা সবই তো লিখলেন, বুঝলাম; কিন্তু স্বাধীনতার কথা তো লিখলেন না, সেটাও লিখেন।' জবাবে মণি সিংহ ও অন্য নেতারা বলেছিলেন, আপনার কথা ঠিক আছে। তবে পরিস্থিতিটা আগে তৈরি হোক, তাছাড়া আপনার নেতা সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে এ বিষয়ে জেনে আসুন। কয়েকদিন পর বঙ্গবন্ধু কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বললেন, আপনাদের প্রস্তাব মানলাম; কিন্তু আমার স্বাধীনতার কথাটা থেকেই গেল। বঙ্গবন্ধুর এই কথাগুলো প্রামাণ্যদলিল, যা খোকা রায়ের লেখা বই এবং মণি সিংহের লেখা বইয়েও আছে। এটা অনেক বড়ো বিষয় যে, বঙ্গবন্ধু ষাটের দশকেই স্বাধীন দেশের কথা ভাবতে শুরু করেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশ চেয়েছেন। বাষট্টির একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে ছাত্রদের আন্দোলন জোরদার করার কথা ছিল। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হয়। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হয়নি, আগেই ছাত্ররা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হলো আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন– বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন।

**প্রশ্ন:** সংবিধানের চার নীতির এক নীতি সমাজতন্ত্র। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে কোন সমাজতন্ত্র চেয়েছেন বা চিন্তা করেছিলেন?

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম:** বাকশাল গঠন নিয়ে তিনি বললেন, "সেলিম আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তোমরা এখানে যা-ই বলো, আমি সব ক্লিয়ারেন্স নিয়েছি। এখন আমি 'রেজিমেন্টেশন' ধরে এগিয়ে যাব।" শুনে বললাম, 'রেজিমেন্টেশন' আর সমাজতন্ত্র তো এক জিনিস নয়। 'রেজিমেন্টেশন' আর বিপ্লবী শৃঙ্খলা এককথা নয়। 'রেজিমেন্টেশন' করে তো পুলিশ বাহিনী। সমাজতন্ত্র করতে চাইলে বিপ্লবী শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং সবাইকে তা বোঝাতে হবে। আমার কথা শুনে একপর্যায়ে তিনি বললেন, ওইসব আমি ব্যবস্থা করছি। তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে চীন না রাশিয়ার মতো সমাজতন্ত্র চান, তা তিনি কার সঙ্গে কথা বলছেন, সেটা বুঝে বলতেন। কাকে কখন কী দিয়ে বুঝ দিতে হয়, তা তিনি খুব ভালো জানতেন।

হ্যাঁ, সমাজতন্ত্র উনি নিজের করে বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে করতে চেয়েছেন, এটা যেমন সত্যি আবার এটাও তো সত্যি যে উনি বাংলাদেশের সংবিধানে কার্ল মার্কসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর কোটেশন যুক্ত করেছেন। কেন! এটাও বুঝতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে লেখা আছে, 'From Each According to Capacity to each According to each Work.' এই নীতির ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টন

হবে। তিনি সমাজতন্ত্র চাইতেন বা চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'সমাজতন্ত্র করব, আমার তো দল নেই।' বাকশাল প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিলাম, আপনি কেন এটা করতে চাইছেন? বলেছিলেন, 'সেলিম তুমি আওয়ামী লীগকে তো চেন না, আমি আওয়ামী লীগকে চিনি। আওয়ামী লীগকে রেখে সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়, আওয়ামী লীগকে ভেঙে দিতে হবে। কিন্তু একটা দল শুধু আওয়ামী লীগকে তো ভাঙতে পারি না। সব দল ভেঙে দেব। সব দল মিলে একটি জাতীয় দল করব।' এটা আমাকে বুঝ দেওয়ার জন্য বলেছিলেন নাকি অন্যকিছু, তা জানি না– তবে এটাই সত্যি। পরে তিনি জাতীয় দল করেছিলেন। (দেখা গেল নির্বাহী কমিটিতে খন্দকার মোশতাকের মতো লোক; কিন্তু সেই জাতীয় দলে মণি সিংহের নাম ছিল না। হয়তো দলের চাপ ছিল, রাখতে পারেননি। কঠিন সময় পার করেছেন তিনি) বলা হয়, বাকশাল পদ্ধতি করেছিলেন, তা ছিল সাময়িক। সব সময় তাঁর মধ্যে দলের টান ও জনগণের টান, দুটোই ছিল প্রবল। শেষ পর্যন্ত জনগণই তাঁকে টেনেছে, জনগণের কাছেই তিনি থেকেছেন আজীবন।

**প্রশ্নঃ** বাকশাল সৃষ্টি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে, এমনটা বলা হয়।

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমঃ** এভাবে বলা ঠিক নয়। তাঁর মৃত্যুর জন্য প্রধানত দায়ী স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি। সেই শত্রুপক্ষ ওতপেতে ছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের পর থেকেই সক্রিয় ছিল। মিলিটারিতে একটা কথা আছে, সব সময় একটা 'কনটেনজেন্সি প্ল্যান' রাখবে, যদি হেরে যাও, তাহলে কী করবে। সেই কনটেনজেন্সি প্ল্যান ১৬ ডিসেম্বর থেকেই শুরু। কেবল সুযোগের অপেক্ষায় ছিল স্বাধীনতাবিরোধীরা। পঁচাত্তরে এসে সুযোগ পেয়ে আঘাত হেনেছে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সেসময়ের আওয়ামী লীগও (কিছু সদস্য) কম দায়ী নয়! অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতাও দায়ী! তিনি বাঙালি বুঝতেন; কিন্তু বাঙালির শ্রেণি বুঝতে চাইতেন না। পরের দিকে কিছুটা বুঝেছিলেন। কর্নেল জামিলের নেতৃত্বে সিকিউরিটির নতুন ব্যাটালিয়ন তৈরি করেছিলেন। সেই বাহিনী কাজ শুরু করার আগেই ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। এমন একটা দিনকে বেছে নিল ঘাতকরা, যেদিন সব জেলার গভর্নররা 'ট্রেনিং' নিতে ঢাকায় রয়েছেন। বাকশাল বাস্তবায়নে কোর্স ট্রেনিংয়ে অংশ নিতে তারা এসেছেন। সব জেলার কমিটি তখন পর্যন্ত ফরমেশনও হয়নি। বড়ো কমিটিগুলো ঘোষণা হলেও তখনও সুগঠিত হয়নি এবং কাজ শুরু করেনি।

> তিনি ভেবেছিলেন তাঁকে কোনো বাঙালি গুলি করতে গেলে হাত কেঁপে যাবে, পারবে না। তিনি বাঙালি বুঝতেন, মোশতাকদের বুঝতেন না। বাঙালির ভেতর যে মোশতাক থাকতে পারে এবং সে যে কত ভয়ংকর হতে পারে! মোশতাক শ্রেণির বিশ্বাসঘাতকদের বঙ্গবন্ধুর মতো নেতাকে গুলি করতে হাত কাঁপবে না, সেটা ভাবতে চাননি

**প্রশ্নঃ** শুনেছি আপনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ছিল আন্তরিক। আপনি তাঁর দলের কর্মী না হয়েও স্নেহের ছিলেন, স্মৃতিতে কোন ঘটনাগুলো বিশেষ মনে হয়?

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমঃ** বঙ্গবন্ধুর নামের সঙ্গে পরিচয় ষাটের দশকে। তখনও রাজনীতিতে জড়িত হইনি। দেশের খবরাখবর নিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের আলোচনায় অন্য নেতাদের নামের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের নামও শুনেছি। তখন আইয়ুব খানের মার্শাল ল চলছে। এবডো বিষয়ে বা যাদের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই সময়ের রাজনীতিবিদদের আলোচনায় তাঁর নাম উচ্চারিত হতো। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ থেকে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি উত্থাপন করলেন, তখন আমি ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী। ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পর সব ধরনের আলোচনায় শেখ মুজিবের নাম আরও বিশেষভাবে আলোচনায় আসত। তখন আমি ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী এবং গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। নীতিগত কারণেই সেই হরতালে বামপন্থিদের সমর্থন ছিল। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন হরতালকে সফল করতে ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় অংশগ্রহণও ছিল। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার, অপপ্রচার আছে বামপন্থিরা ছয় দফার বিরোধিতা করেছিল, হরতাল সমর্থন করেনি। কমিউনিস্টরা ছয় দফাকে সিআইয়ের ষড়যন্ত্র বলেছিল, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা বিষয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত ছিল, এই দাবিগুলো ন্যায্য দাবি; কিন্তু মুক্তির সনদ নয়। মুক্তির সনদ হতে হলে এই দাবিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ থাকতে হবে, কৃষক শ্রমিকের দাবি থাকতে হবে, অন্য পেশাজীবীদের দাবি থাকতে হবে এবং ব্যাংক-বিমা জাতীয়করণের কথা থাকতে হবে। ইতিহাস এ কথাই বলে, এই দাবিগুলো যখন ছয় দফার সঙ্গে যুক্ত করে ১১ দফা হলো; এটাও ইতিহাসে সাক্ষী উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল ১১ দফার ভিত্তিতে– এককভাবে ছয় দফার ভিত্তিতে নয়। যা হোক, ৭ জুন হরতালের দিন দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মতিঝিল স্টেডিয়ামের সামনে জনগণের সঙ্গে পিকেটিং করছি। ভোর থেকে পিকেটিং করছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে একটা গাড়ি এসে আমাকে ধরে রমনা থানায় নিয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেটের নামটা ভুলিনি, বখত সাহেব, একটা সামারি কোর্ট করে এক মাসের জেল দিয়ে দিলেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সারারাত কোনোরকম ছিলাম। পরদিন নামধাম লেখা হলো। ওখানে নতুন টোয়েন্টি, পুরান টোয়েন্টি এবং পাগলা ওয়ার্ড, আবার আছে দেওয়ানি নামে একটা জায়গা। হঠাৎ দেখলাম এর পাশেই আছে একটা কাঠের দরজা। ওপাশের পুরো এলাকাটায় যেখান দিয়ে যাওয়া-আসা করা যায়, দরজাটা বন্ধ থাকে। কিছুক্ষণ পর দরজাটা খুলে গেল। সেখান দিয়ে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, সিগারেটের পাইপ হাতে একজন সৌম্য চেহারার ব্যক্তি এলেন, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে হাত নাড়লেন। তিনি আগে থেকেই এই কারাগারে আছেন। আমিও তাঁকে দেখছি, তখন অন্যরা বললেন, উনিই শেখ মুজিবুর রহমান। এই প্রথম কাছে থেকে তাঁকে দেখলাম। এরপর পল্টন ময়দানে তাঁর একটা ভাষণ শুনতে গিয়েছিলাম, তখনও দূর থেকে দেখেছি। এরপর থেকে ক্রমাগত তিনি গ্রেফতার হতেন আর জেল থেকে বের হয়ে সভা করতেন। কিছুদিন পর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পড়লেন। তখন

কয়েকটি সভায় উপস্থিত থেকেছি। বঙ্গবন্ধু নাম দেওয়া হলো, সেই সভায়ও ছিলাম। যদিও এই মিটিং নিয়ে মতবিরোধ ছিল। তখন ছাত্র ইউনিয়নের প্রস্তাব ছিল, কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়া সবাইকে একসঙ্গে সংবর্ধনা দেওয়া হোক। কিন্তু ছাত্রলীগ সেদিন তা মানেনি। হয়তো তাদের গোপন ইচ্ছা ছিল যে, বঙ্গবন্ধুকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে এই নাম দিয়ে ভূষিত করবে। তখন জেল থেকে যারা ছাড়া পেয়েছেন, শেখ মুজিবুর রহমান, মণি সিংহ, মতিয়া চৌধুরী এবং আরও অনেক বিপ্লবী, যারা বছরের পর বছর জেলখানায় আটক থেকেছেন এবং মুক্তি পেয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর জেলখানার রোজনামচায় এক জায়গায় স্পষ্টভাবে আছে। বঙ্গবন্ধু একটা জায়গায় বলছেন, 'তখন বামপন্থিরা বা কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা জেলখানায় অনেক বেশি সংখ্যায় ছিল। জেলখানায় কমিউনিস্টদের কাছে তাদের যেতে দেওয়া হতো না। কর্তৃপক্ষ মনে করত ওদের সাথে মিশলে আমাদের মগজ ধোলাই করবে।' বঙ্গবন্ধু এই বিষয়ে আর লেখা বাড়াননি।

এ ছাড়াও একুশে ফেব্রুয়ারির দিন বা এমন অনেক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে দেখা হয়েছে। কথাবার্তা হতো না।

**প্রশ্ন:** বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এবং পরে ১১ দফা– মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে বামপন্থিদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মতবিনিময় এবং আপনার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া– জানতে চাই?

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম:** বঙ্গবন্ধু যখন সত্তরের নির্বাচন করলেন, তখন তিনি বলেছিলেন ছয় দফা বাস্তবায়ন করব, ১১ দফাও বাস্তবায়ন করব। তিনি যদি ১১ দফা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার না করতেন, তাহলে গণ-আন্দোলনে এত স্রোতধারা এসে একসঙ্গে মিলতে পারত না। এর চেয়েও বড়ো কথা, বঙ্গবন্ধুর মুখে উচ্চারিত কথাগুলোই ঐতিহাসিকভাবে স্থায়িত্ব পায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধে যে কৃষক শ্রমিকের অংশগ্রহণ এবং ৭ মার্চের ভাষণ, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুর কাছে সেই মুক্তিটা যে কোনো পথে হবে, এটাও একটা বিষয় ছিল। জনগণের সামগ্রিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হলো। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ কেবল ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ ছিল না। দশকের পর দশকের আন্দোলন-সংগ্রামের চূড়ান্ত যুদ্ধটা ছিল বাঙালির ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। তখন এই দেশে রাজনীতিতে দুটি ধারা বহমান ছিল। একটি জাতীয়তাবাদ ধারা, তা বহন করত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ এবং আরেকটি বামধারা, যা বহন করত কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন। মুক্তিযুদ্ধের সময় সব ধারা এসে একসঙ্গে মিলেছিল। সেই সময়ের প্রেক্ষাপট বলা দরকার এই জন্য যে, মুক্তিযুদ্ধের সব ধারা বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপকে সমর্থন দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করে। আমিও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এদেশের মেহনতি মানুষের সত্যিকার মুক্তি হবে– সেই স্বপ্ন নিয়ে। সেই মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য লড়াইয়ের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে কি না, সেটা পরের বিষয়; কিন্তু ১৯৭১-এর পরিস্থিতিতে আমরা মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারিনি।

মুক্তিযুদ্ধে তিনি বাংলাদেশে উপস্থিত ছিলেন না; কিন্তু জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানটা আমাদের সঙ্গে ছিল। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের আগে ছিলেন কিছুটা দূরের মানুষ এবং বাঙালির জাতীয় নেতা। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা একটা পর্যায়ে আন্তরিকতা, স্নেহ ও ভরসার জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়। এই সম্পর্কের শুরু তিনি যেদিন দ্বিতীয়বার স্বাধীন দেশে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি, যেদিন তিনি পাকিস্তান থেকে ঢাকা ফিরেছেন সেদিন। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করা হয়। সেখানে ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। বিমানবন্দরে নেমে অন্যদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন। সামনেই ছাত্র ইউনিয়নের বেশ কজন ছিলাম। আমার সামনে এসে বললেন, 'তোমরা ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরাও আছ, 'বেশ ভালো' বলে পিঠে-কাঁধে চাপড়ে দিলেন।

সেই বছরই এপ্রিলে ডাকসু নির্বাচন হলো। আমি ছাত্র ইউনিয়নের প্যানেলে ভিপি নির্বাচিত হলাম। তখন থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু। এরপর যত দিন জীবিত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করা, কথা বলার জন্য তাঁর অফিস ছিল আমার জন্য উন্মুক্ত। আমাকে তিনি স্নেহ করতেন। অনেক সময় অনেক বিষয় আলোচনা করতেন। অনেক ব্যাপারে ভরসা করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী ও অন্যরা যারা ছিলেন, সবাই জানতেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতে দিতে অসুবিধা নেই। সেই সম্পর্কের সূত্রে আমিও প্রায়ই যেতাম দেখা করতে, আমার সঙ্গে অনেক বিষয়েই আলোচনা করতেন। এমনকি পারিবারিক আলোচনাও।

একদিনের ঘটনা মনে পড়ে, বঙ্গবন্ধু বললেন, সেলিম তুমি আজ আমার সঙ্গে খাবে। সেসময়টায় মিন্টো রোডের কোনায় পুরোনো বঙ্গভবনে অফিস করতেন তিনি। বাড়ি থেকে আনা টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাবার সাজানো হচ্ছে– ভাত, ডাল, মুরগির ঝোল ও ভর্তা ছিল। বলছেন, 'সেলিম তোমার ভাবির রান্না ছাড়া তো আমার পোষায় না।' বললাম, এভাবে রোজ রোজ টিফিন ক্যারিয়ারে রান্না আসে, তো ভাবিকে এখানে নিয়ে আসেন না কেন? বঙ্গবন্ধুর জবাবটা ছিল এমন– 'শোনো, এখন আমি প্রধানমন্ত্রী আছি, কালকে তো না-ও থাকতে পারি। এই বাড়িটির প্রতিটি রুমে এয়ার কন্ডিশন করা। এই পরিবেশে তোমার ভাবি অভ্যস্ত হলে পরে প্রধানমন্ত্রী যখন থাকব না, তখন কী হবে?'

আরেকদিনের ঘটনা। জাসদের হরতাল চলছে ঢাকা শহরে। শেখ কামাল গাড়ি করে যাচ্ছিল, পুলিশ তার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এই ঘটনাটি খুব অপপ্রচার হয়। মিথ্যা প্রচার করা হয় যে, কামাল বাংলাদেশ ব্যাংক লুট করতে গাড়ি নিয়ে এভাবে গিয়েছিল। শেখ কামাল একটু ডানপিটে ধরনের ছিল। তার ভাবনাটা এমন ছিল যে, জাসদের হরতাল ঠেকানোর জন্য শুধু পুলিশের টহলে হবে না, পাশাপাশি ছাত্রলীগ কর্মীদেরও মাঠে নামা দরকার। তাই কয়েকজন বন্ধু নিয়ে গাড়িতে বেরিয়েছিল কামাল। এই ঘটনাটা অপপ্রচার হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, 'সেলিম কামালকে নিয়ে কী করি বলো তো, ওকে কি বিদেশে পাঠাব পড়ার জন্য? শুনে তো বিপদে পড়লাম মনে হলো। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুকে কী বলা যায়! বললাম, যাই করেন কামালের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে করাই ভালো হবে। পরে আর কামালকে পাঠাননি বা যায়নি। ততদিনে কামাল নাটক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জড়িয়ে গেল, ভালোই ছিল কামাল এসব নিয়ে। এ ছাড়াও দেখা হলে বঙ্গবন্ধু বলতেন, সমাজতন্ত্র আমি বাস্তবায়ন করবই। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, ওনার অফিসে বসে আছি, বঙ্গবন্ধু ঘরে ঢুকলেন, একটু যেন উত্তেজিত মনে হলো। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'এই যে সেলিম, সই-সাবুদ করে দিয়ে আসলাম ফাইনাল ডকুমেন্টে। সব ব্যাংক-বিমা অ্যামেন্ডমেন্ট সম্পত্তি, সব জাতীয়করণের নির্দেশ দিয়ে আসলাম। সমাজতন্ত্র ছাড়া আমার উপায় নেই, এই পথেই যেতে হবে।'

আরেক দিনের ঘটনা– গণভবনে বসে আছি, তখন খবর আসে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে জাসদের ছেলেরা ঘেরাও করে রেখেছে। বাহাত্তর সালে সম্ভবত অটোপ্রমোশন বা এমনই একটা দাবিতে ভিসি অবরুদ্ধ; কিন্তু সেটা ছিল অন্যায্য দাবি। ঘটনা শোনার পর বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সেলিম চলো, ওখানে যাব।' সিকিউরিটি অফিসার বললেন,

যাবেন? বঙ্গবন্ধু তখন 'সরে যাও' বলে সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। দুজনেই সেদিন সোজা গিয়ে হাজির হলাম ভিসির গেটে। দেখি দুই পাশে সব বসে আছে। বঙ্গবন্ধু গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে হাত তুলে মাঝখান দিয়ে হেঁটে ভিসির অফিসে ঢুকলেন। দেরি না করে ভিসিকে সঙ্গে নিয়ে বসে থাকা ছাত্রদের মাঝখান দিয়ে এসে গাড়িতে বসলেন। সঙ্গে আমিও আছি। এই যে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও সাহসী পদক্ষেপ, এমনই ছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেদিন নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তাই করেননি। সেসময়ে নিরাপত্তার বিষয়টি এত কড়াকড়ি ছিল না। এমন আরও অনেক ঘটনা আছে যে, তিনি নিরাপত্তার কথা ভাবেননি।

**প্রশ্ন:** বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বছরে কী অঙ্গীকার হতে পারে?

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম:** বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ঘোষণা করতে হবে। ক্ষমতাবানদের গণমানুষের অধিকারকে প্রাধান্য দিতে হবে, যা বঙ্গবন্ধু করেছেন। তাঁর আদর্শের জায়গাগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে। রাজনীতি এখন আমলাদের হাতে চলে গেছে। আগামী প্রজন্মকে বলব, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এটুকু দিয়ে তাঁকে চেনা ও জানা যাবে না। স্বাধীনতার আগে ও পরে এবং তাঁর উচ্চারিত বক্তব্যগুলো, কাজকর্ম, রাজনীতিবিদ ও জননেতা হয়ে ওঠার গতিধারার নিরিখে তাঁকে সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে, সবাইকে জানতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ের মুসলিম লীগের ছাত্রকর্মী হিসেবে মূল্যায়ন করলে চলবে না। সেই শেখ মুজিবুরের তো রূপান্তর ঘটেছে। ক্রমাগত রূপান্তর হয়েছে তাঁর, সেই রূপান্তর হয়েছে প্রগতির দিকে। কেন হয়েছে? কারণ যত কিছুই তাঁকে পেছনে টানুক, জনতার সঙ্গ তিনি কখনই ছাড়েননি। তাই বলে তিনি পুরো রূপান্তরিত, তা-ও না আবার এক জায়গায় ছিলেন, সেটাও না। ইতিহাসের গতিধারায় তাঁকে ভাবতে হবে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও তিনি ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারার পক্ষেই থেকেছেন আজীবন। এখানেই ব্যক্তি হিসেবে তাঁর বিশেষত্ব। এটা ব্যক্তিগত আর ইতিহাসের মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ের বাঙালির আগের সব সংগ্রামের ঐক্যের প্রতীক হয়ে সেটাকে ধারণ করেছেন তিনি, Personified the Unity Of Bengali People. বাঙালি জনগণের ঐক্যের প্রতিনিধি ও প্রতীক হয়েছেন। ইতিহাস তাঁকে সেখানে নিয়ে গেছে এবং তিনিও সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। একাত্তরই তো শেষকথা নয়। একে তো এগিয়ে নিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে বলব, 'ভিশন মুক্তিযুদ্ধ'। 'মুক্তিযুদ্ধ-১৯৭১' এই ট্র্যাকে ফিরতে হবে। বাহাত্তরের সংবিধানের মর্মকথা গুরুত্ব দিয়ে তা বাস্তবায়ন করা। বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করতেন। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলাই হবে বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানানোর উত্তম উপায়।


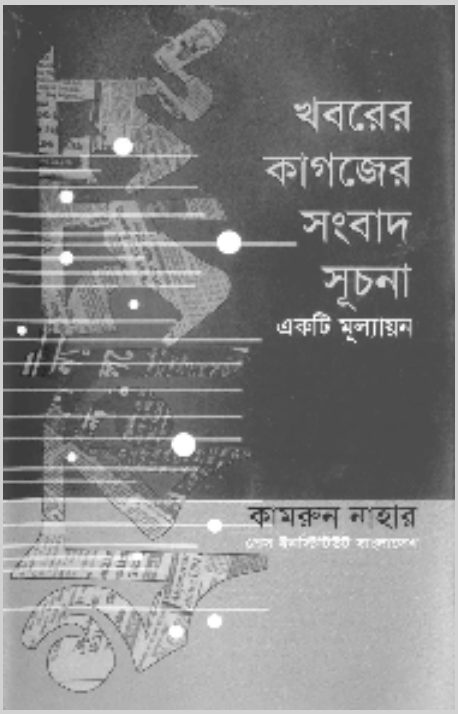


**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

# ডেটলাইন ১৫ আগস্ট পঁচাত্তর

**মুহম্মদ শফিকুর রহমান**

ডেটলাইন ১৫ আগস্ট ১৯৭৫। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবন। এর চেয়ে বেশি বলার প্রয়োজন পড়ে না, কারণ বাঙালি জাতির ঠিকানা এখানে অঙ্কিত যেন শিল্পী হাশেম খানের হস্তাক্ষরের সংবিধান। সুবহে সাদেক পেরিয়ে ফজরের আজান হচ্ছে। মুয়াজ্জিন উচ্চারণ করছেন, 'আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম (নামাজ নিদ্রা থেকে উত্তম)'। মুয়াজ্জিনের সুমধুর কণ্ঠ ভোরের নির্মল বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল তখনও। মুসল্লিরা মসজিদের পথে ছুটছেন মুক্তির অন্বেষায়। বাসভবনে লুটিয়ে পড়ল বাংলার হৃদয়। সিঁড়িতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তাক্ত দেহ, সিঁড়ির গোড়ায় শেখ কামাল, দোতলায় শোয়ার ঘরে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ আবু নাসের। অন্য বাড়িতে শেখ ফজলুল হক মনি, আরজু মনি, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু নিথর নিস্তব্ধ। নবপরিণীতা দুই পুত্রবধূ শেখ সুলতানা কামাল, শেখ রোজী জামালের হাতের মেহেদির রং তখনও শুকোয়নি। কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না তুলে বুকের তাজা রক্ত ৩২ নম্বরের বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে গড়াতে গড়াতে বাংলার সবুজ মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর ধুয়ে দিল। কী পবিত্র সেই রক্তের ধারা। ৪৪টি বছর চলে গেল। আজও সেই রক্তধারা ধুয়ে পবিত্র করে চলেছে বাংলার মাটি। কী অসাধারণ, কী অপ্রতিরোধ্য। একে থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। এই বাংলায় নেই, প্রাচ্য ছাড়িয়ে প্রতীচ্যেও নেই। পাশ দিয়ে যেতে যেতে কে যেন ডেকে বলে– তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এখানে বাংলার হৃদয় ঘুমিয়ে আছে, একটু উষ্ণতা নিয়ে যাও পথিক, পথ হারাবে না। কে যেন একজন বলেছিল তোমরা বাংলার হৃদয়ের রক্ত ঝরিয়েছ ঠিকই এবং সেই সঙ্গে ওই ৩২ নম্বরের

বাসভবন কিংবা টুঙ্গিপাড়ার সমাধি তাবৎ মুক্তিকামী মানুষের তীর্থভূমিতেও পরিণত করে দিয়ে গেলে। ক্লান্ত-শ্রান্ত পথিককে মহাকালের পথে থমকে দাঁড়াতেই হবে এখানে এই ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে। যেতে হবে টুঙ্গিপাড়ার সমাধির পাশে। বলতে হবে পিতা আমাদের ক্ষমা করুন।

॥ দুই ॥

হে বাংলার পুরনারী আপনারা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবনের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবকে চেনেন কি? না চিনলে আমি চিনিয়ে দিচ্ছি দয়া করে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বঙ্গমাতা হওয়ার জন্য তাঁকে রাজপথে গলাবাজি করতে হয়নি। অতিসাধারণ জীবনযাপন করেও অসাধারণ এক উচ্চতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আপনাদের সামনে যে উদাহরণ রেখে গেলেন, আমি হলফ করে বলতে পারি– আগত-অনাগত প্রজন্মের জন্য ভাবতে হবে না। বরং এক অভাবনীয় বর্ণাঢ্য জীবন লাভে সক্ষম হবেন। তাঁর সংগ্রামী জীবন কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব– একদিকে স্বামী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পারিবারিক সংসার সামলেছেন, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর রাজনৈতিক সংসারও ম্যানেজ করেছেন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতার মতো। বঙ্গবন্ধু তো এক যুগেরও বেশি সময় পাকিস্তানি মিলিটারি জান্তার কারাগারে কাটিয়েছেন। এর মধ্যেই শেখ হাসিনার মতো সময়ের সাহসী একজন রাষ্ট্রনায়ককে উপহার দিয়েছেন। একজন শেখ কামালকে উপহার দিয়েছেন অনাগত তরুণদের স্বপ্নের নায়ক হিসেবে। বাংলার যে কন্যা শেখ হাসিনার জীবনের পাঠ নেবে, তাকে জীবন-সংসার গোছাতে দ্বিতীয় পাঠ নিতে হবে না। যে তরুণ শেখ কামালকে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করবে, তাকে কোনো পশ্চাৎপদতা স্পর্শ করবে না; কোনো কুপথ টানতে পারবে না; সন্ত্রাস-মাদকাসক্তি তার কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

॥ তিন ॥

বঙ্গমাতার জন্ম ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট। খুব ছেলেবেলায় অর্থাৎ শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন হন এবং মাত্র তিন বছর বয়সে খেলার সাথীর মতো বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী হিসেবে এই পরিবারে পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা শেখ সায়েরা খাতুনের আদর-যত্নে বড়ো হন। শেখ কামালের জন্ম ১৯৪৯ সালের ৫ আগস্ট। লক্ষ করার বিষয় হলো, ১৯৭৫ সালের এই আগস্টের ১৫ তারিখ ঘটে ইতিহাসের নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং কেবল বঙ্গবন্ধু নন; তাঁর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব; তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু শেখ রাসেল; দুই পুত্রবধূ নবপরিণীতা সুলতানা কামাল ও রোজী জামালসহ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৩২ নম্বরের বাসভবনের সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে বাংলাদেশ মিলিটারির বিপথগামী সদস্যরা। অন্য বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের। সেদিন দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা শেখ হাসিনার স্বামী প্রখ্যাত অণুবিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। ড. ওয়াজেদ সেখানে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণারত ছিলেন। এই শোকের মাসে বঙ্গমাতা ও শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা কতখানি কষ্টের? তারপরও দুটি জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলেও শোকগাথাই হয়েছে বেশি। সবাই তো আর খালেদা জিয়া নয় যে ১৫ আগস্ট ভুয়া জন্মদিন ঘোষণা করে উৎসব করবেন। এ দিন সত্যিকার জন্মদিন হলেও তো করা উচিত নয়। একজন সাধারণ নাগরিকও এদিন নিজের সত্যিকার জন্মদিনও পালন করে না। রুচিতে বাধে। বাধে না কেবল ওই স্বশিক্ষিত ম্যাডামের। তাছাড়া তিনি তো আর সাধারণ নারী নন, তিনবারের প্রধানমন্ত্রী। তার মধ্যে ভব্যতা আশা করাটা বেশি কিছু কি? অবশ্য এর জন্য শিক্ষা, পরিবেশ ও ঐতিহ্য থাকতে হয়।

**॥ চার ॥**

শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবের জীবনদর্শন শাশ্বত বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি। তুলনা হতে পারে কেবল অপর মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত অবরোধবাসী নারীদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে সংসার-ধর্মের বাইরেও যে সমাজে-রাষ্ট্রে নারীদের করণীয় আছে, তার পথ দেখিয়েছেন। শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবও বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক সংসার ও রাজনৈতিক সংসার দুটিই সমভাবে সামলেও যে গণমানুষকে পথ দেখানো যায়, সাধারণ গৃহবধূ হয়েও আন্দোলন-সংগ্রামের পতাকা তুলে ধরা যায়, তার অনুকরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কারাগারে কাটিয়েছেন। বেগম মুজিব কখনো তাঁকে পিছু টানেননি। বরং শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও যেমন ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন, তেমনই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংসার ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগকেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে ছাত্রলীগ নেতাদের দিকনির্দেশনার পাশাপাশি অর্থেরও জোগান দিয়েছেন, সংসারের ধান-চাল বেঁচেও। নিজে যেমন বাঙালি মুসলমান গৃহবধূর মতো সাদামাটা জীবনযাপন করেছেন, পোশাক-আশাকও তেমনই এবং রুচিসম্মত। একমুহূর্তের জন্যও মাথার কাপড় সরত না। অনেক সময় অর্থাভাবে ছেলেমেয়েদের খাবার থালার খিচুড়ির বাইরে কিছু দিতে পারেননি। ওই পরিবারে এজন্য কোনো আফসোস ছিল না। বরং লেখাপড়ার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চায় মনোনিবেশ ছিল ঐতিহ্য। এমনকি বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অবিসংবাদী নেতা, বাঙালির জাতি-রাষ্ট্রের পিতা বা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হওয়ার পরও বেগম মুজিবের পোশাক পালটায়নি, গায়ে বিদেশি শিপন ওঠেনি। ঠিক একইভাবে দেখা গেছে, তাঁদের আদরের প্রথম সন্তান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে আসতেন সাধারণ সুতি শাড়ি পরে। শেখ কামালকেও কখনো শার্ট ইন করে ক্যাম্পাসে আসতে দেখা যায়নি। ওপেন ফুলহাতা টি-শার্ট, প্যান্ট আর পায়ে সাধারণ স্যান্ডেল বা স্যান্ডেল শু। কোনো দিন স্যুট পরতে দেখা যায়নি। কেবল একবার দেখা গেছে বিয়ের সময়। ছাত্রলীগ করতেন; কিন্তু কোনো দিন নেতৃত্বের আসনে বসেননি। পরিবারের Culture ছিল 'Simple living high thinking'।

**॥ পাঁচ ॥**

বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছেন– এই ছিল তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা; কিন্তু বাসায় ধর্ম, দর্শন, মহাপুরুষদের জীবনী পড়তেন। শুনেছি বার্ট্রান্ড রাসেল পড়তে পড়তে 'রাসেল' শব্দটি পছন্দ হয় এবং এভাবেই ছোটো ছেলের নাম রাখেন শেখ রাসেল। রাজনৈতিক সচেতনতার বিষয়টি যেমন নিজের জীবনের উপলব্ধি দিয়ে শানিত করেছেন, তেমনই ছেলেবেলা থেকেই মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রমুখকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। শেখ হাসিনাসহ সন্তানরাও এভারেস্ট বড়ো হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর মতো কালজয়ী ব্যক্তিত্ব তো ঘরেই রয়েছেন। আজকাল একজন নেত্রী নামের পেছনে 'আপসহীন' শব্দটি ব্যবহার করেন। অথচ বেগম মুজিব আন্দোলনে-সংগ্রামে কতখানি আপসহীন, দেশের প্রতি কতখানি বিশ্বস্ত থেকেছেন

তার একটি উদাহরণ– বঙ্গবন্ধু তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র চলছে। তৎকালীন মিলিটারি শাসক আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানে নেতাদের বৈঠক আহ্বান করলেন এবং বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালেন। কেউ কেউ এও বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনরক্ষা হোক চাইলে প্যারোলে মুক্তি দরকার। নেতাদের অনেকেই এ প্রস্তাবে রাজি ছিলেন; কিন্তু বেগম মুজিব এত বড়ো আপসহীন, দূরদর্শী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন যে স্বামীর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও প্যারোলের বিপক্ষে দাঁড়ালেন এবং প্যারোলে মুক্তি না নেওয়ার জন্য চিঠি লিখে কন্যা শেখ হাসিনা ও জামাতা ওয়াজেদ মিয়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কাছে বার্তা পাঠালেন। সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক গবেষকরা তাঁকে বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসেবে মনে করেন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এ বাড়ি, সে বাড়ি আত্মগোপনের একপর্যায়ে সন্তানসহ গ্রেফতার হয়ে ধানমন্ডির একটি বাড়িতে (সাব-জেল) ওঠেন। এর আগেই বড়ো দুই ছেলে শেখ কামাল ও শেখ জামালকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য ভারতে পাঠিয়ে দেন। বলার অপেক্ষা রাখে না সেদিন শেখ রাসেলের বয়সও যদি ১৫-১৬ বছর হতো, তাকেও পাঠিয়ে দিতেন দেশের জন্য যুদ্ধ করতে। শেখ হাসিনা তখন সন্তানসম্ভবা, নয়তো তিনিও যুদ্ধে যেতেন।

**॥ ছয় ॥**

বাংলাদেশের নারীরা অবহেলিত। বেগম রোকেয়ার ভাষায় অবরোধবাসিনী। তারপরও সংসার-ধর্ম পালন করেও একজন নারী যে নিজের সন্তানসন্ততি তথা পরিবারের বাইরেও বিশাল জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন, তার প্রমাণ বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব। বেগম মুজিব সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষায় মানুষের মতো মানুষ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার মধ্যেও এই গুণাবলি লক্ষণীয়। শেখ হাসিনার সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয় যেমন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইটি বিশেষজ্ঞ, তেমনই কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলও অটিজমের ওপর কাজ করতে করতে এখন জাতিসংঘের পরামর্শদাতা। জয় যেমন হার্ভার্ড এডুকেটেড, তেমনই পুতুলও বোস্টনের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। শেখ রেহানার ছেলে ববি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে এখন জয়-পুতুলের পাশাপাশি শেখ হাসিনাকেও সাহায্য করছেন। রেহানার বড়ো মেয়ে টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক তো হাউস অব কমন্সে ঝড় তুলছেন নির্বাচিত ব্রিটিশ লেবার পার্টির এমপি হিসেবে। রেহানার ছোটো মেয়েও অক্সফোর্ডে লেখাপড়া শেষ করার পথে। অথচ অনেকেই জানেন না, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর শেখ রেহানা লন্ডনে বাংলাদেশ সেন্টারে রিসিপশনিস্টের চাকরি করেছেন।

> বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অবিসংবাদী নেতা, বাঙালির জাতি-রাষ্ট্রের পিতা বা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হওয়ার পরও বেগম মুজিবের পোশাক পালটায়নি, গায়ে বিদেশি শিপন ওঠেনি। ঠিক একইভাবে দেখা গেছে, তাঁদের আদরের প্রথম সন্তান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে আসতেন সাধারণ সুতি শাড়ি পরে

**॥ সাত ॥**

আজও চোখ বন্ধ করলে তাঁর মুখচ্ছবি সামনে ভেসে বেড়ায়– উজ্জ্বল, টল শ্যামলা গায়ের রং, ঘন কালো ব্যাকব্রাশ করা চুল, মোটা গোঁফ, মোটা কালো ফ্রেমের চশমা এবং মেদহীন পাতলা শরীর হলেও আর দশটি তরুণের চেয়ে আলাদা ব্যক্তিত্বের অধিকারী। প্রাণোচ্ছল মেধাবী, উদ্যমী, পরিশ্রমী, দক্ষ সংগঠক এবং সৃষ্টিশীল। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার পর এত বড়ো ক্ষমতার ছত্রছায়া অর্থাৎ পিতার রাষ্ট্রক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে তরুণ কেবল ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সদস্য হয়েছেন। ইচ্ছে করলে বড়ো কোনো পদে যেতে পারতেন। যাননি। এটাই ছিল এই পরিবারের স্বাতন্ত্র্য শিক্ষা, কালচার। মনে পড়ছে, সম্ভবত ১৯৭৪ সাল। লাইব্রেরির পেছনে শরিফ মিয়ার ক্যান্টিন। ভদ্রলোক টিপিক্যাল ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলতেন। আমরা তার ওখানে চা-শিঙাড়া খেতাম। একদিন ঢুকে দেখি ছালার চট পরা কবি সাফদার সিদ্দিকীও চা খাচ্ছেন। আমাকে চিনত কবি নির্মলেন্দু গুণ। রফিক আজাদ, মহাদেব সাহা, আবুল হাসান, সেলিম আল-দীন, আখতারুন্নবীর (কবি ও লেখক) সঙ্গেও আমার সখ্য ছিল। একপর্যায়ে সাফদার বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার সম্পর্কে খুব আপত্তিকর কিছু মন্তব্য করল। তাকিয়ে দেখলাম ছাত্রলীগের কিছু কর্মী কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকাচ্ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, সাফদার তোমার কথাটি উইথড্র করো। সে করল না, তখন আমি ওর হাত ধরে বেরিয়ে যাচ্ছি– এমন সময় আমার চেনা এক ছাত্রলীগ কর্মী দৌড়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, শফিক ভাই, ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ওকে ভালো করে গাঁজা খাওয়াব। বললাম, দেখো ও কবি, কবিরা গাঁজা খেয়ে কত কিছু বলে, ও ধরতে নেই। আমি ওকে নিয়ে লাইব্রেরির পূর্বপাশে এসে একটা রিকশা ডাকলাম এবং হাতে ১০ টাকা দিয়ে বললাম, এই পথে চলে যাও, আজ আর ক্যাম্পাসে এসো না। আমি কলা ভবনের দিকে চলে আসি। কিছুক্ষণ পর কবি রফিক আজাদ ও কবি মহাদেব সাহা এসে বললেন, ছাত্রলীগের ছেলেরা সাফদারকে ধরে নিয়ে গেছে। মাথা কামিয়ে ক্যাম্পাসে ঘোরাবে এবং গাঁজা খাওয়াবে। আমি তাদের সঙ্গে যেতে যেতে দেখলাম বন্ধুবেষ্টিত শেখ কামাল, কলা ভবনের গাড়ি বারান্দায়। কামালকে ঘটনাটা বললাম। শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলল, আপনিও চলুন। কামাল সরাসরি ওদের ভিড় থেকে সাফদারকে হাত ধরে বের করে নিয়ে এলো। ওকে গাড়ির পেছনে এবং আমাকে ড্রাইভিং সিটের পাশে বসিয়ে স্টার্ট করে বলল, কোথায় যাবেন? বললাম, প্রেস ক্লাবে নামিয়ে দাও। কামাল তা-ই করল। গাড়ি থেকে নামিয়ে সাফদারদের হাতে একটা নোট গুঁজে দিয়ে বলল, দুই-তিনদিন আর ক্যাম্পাসে যাবেন না। নোটটা ভালো করে দেখিনি, পঞ্চাশও হতে পারে, একশও হতে পারে। টাকাটা হাতে দিতে দিতে বলল, এত সুন্দর কবিতা লেখেন, গাঁজা খান কেন?

**॥ আট ॥**

বড়ো বোনের সহপাঠী হিসেবে তাঁকে দেখেছি দারুণ স্মার্ট আদবকায়দাসম্পন্ন তরুণ। স্বাধীনতার পর প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবীরা

যেভাবে বঙ্গবন্ধু সরকারের কুৎসা রটাচ্ছিল, ঠিক একইভাবে শেখ কামাল সম্পর্কেও যা-তা বানোয়াট কাহিনি প্রচার করছিল। তৎকালীন জাসদের মুখপাত্র 'গণকণ্ঠ' পত্রিকা বা ভাসানী ন্যাপের 'হক কথা' এক্ষেত্রে জঘন্য ভূমিকা পালন করে। আমি কাজ করতাম 'ইত্তেফাক'-এ। তাতে নিউজ সেকশনের সতর্কতায়, বিশেষ করে মরহুম আসাফ-উদ-দৌলা রেজা ভাইয়ের নেতৃত্বের কারণে হার্ড নিউজে গণ্ডগোল করার সুযোগ না থাকলেও সম্পাদকীয় পাতায় খন্দকার আবদুল হামিদ, আবুল মনসুর আহমদরা জনকণ্ঠের ভূমিকা পালন করেছে। শেখ কামালের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগ আনা হয়েছিল, এ যে কত বড়ো মিথ্যা, তার প্রমাণ হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ভোল্ট বাইরের কারও পক্ষে ভাঙা সম্ভব নয়। তাছাড়া শেখ কামাল যে কেবল রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী বা প্রধানমন্ত্রী বা সরকারপ্রধানের ছেলে তা তো নয়, সে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির জন্মদাতা পিতার সন্তান, তার অর্থের প্রয়োজন পড়লে কি ব্যাংক ডাকাতি করতে হয়? অথচ একশ্রেণির মতলববাজ মুখে মুখে কুৎসা রটিয়েছে। বিশাল হৃদয়ের বঙ্গবন্ধু এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। সর্বশেষ দেখলাম ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে দুর্নীতির মামলায় লন্ডন পলাতক জিয়া-খালেদার ছেলে তারেক শেখ কামালের কুৎসা রটাল। শেখ কামালের পায়ের নখের সমান শিক্ষা, যোগ্যতা যার নেই, বরং দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত, সে যখন কামালকে কটাক্ষ করে, তখন ওদের আসল চেহারাই ফুটে ওঠে। শেখ কামালের মধ্যে যেমন দেখেছি, তেমনই দেখছি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার মধ্যেও। শেখ হাসিনা যেমন সাদামাটা জীবনযাপন করেন, তেমনই দেশের এক নম্বর পরিবারের সন্তান হয়েও শেখ কামাল ব্যবসায় নামেনি, হাওয়া ভবন, খোয়ার ভবন, ডান্ডি ডায়িং, কোকো ওয়ান টু গড়ে তোলেননি, বরং লেখাপড়া করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি ছাত্ররাজনীতি যেমন করেছেন (ছাত্রলীগ), তেমনই আবাহনী ক্রীড়া চক্র, স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা থিয়েটার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যেগুলো আজ এত বছর পরও আধুনিক স্পোর্টস, সংগীত ও নাট্যাঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়ে চলছে। বস্তুত 'Simple living high thinking' বঙ্গবন্ধু পরিবারে চর্চা হতো বলেই তাদের মধ্যে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে দেশ ও জাতির স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে।

**॥ নয় ॥**

আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে হাঁটছে। আমরা এখন মধ্যম আয়ের দেশের আত্মপ্রত্যয়ী নাগরিক। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করলে ১৯৮৫-৯০ এর মধ্যেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হতো এবং এখন আমরা আর্থসামাজিকভাবে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশের ফ্লাইওভারে হাঁটতাম। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজশে তাদের এজেন্ট মোশতাক-জিয়াকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করায়। হত্যা করায় বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেলকে হত্যা করে যাতে ভবিষ্যতে এ পরিবারের আর কেউ দেশের হাল ধরার সুযোগ না পায়। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন, Emergence of Bangladesh is my personal defeat. এই মানসিকতা তারা পরিহার করেছে বলে মনে হয় না আজও। মূলত বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দেওয়ার পর থেকেই কিসিঞ্জাররা বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কিন্তু না ছয় দফা, না উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, না মুক্তিযুদ্ধে বিজয়– কোনোটাই ঠেকাতে না পারলেও চক্রান্ত অব্যাহত রাখে। মুক্তিযুদ্ধের মাঝেই মোশতাক-জিয়া ভারতের মাটিতে বসেই চক্রান্ত শুরু করে। মুজিবনগর গভর্নমেন্ট জানতে পেরে তাদের Inactive করে রাখে। কিন্তু পশুর খাসলত যার, সে কি সংশোধন হয়? আর তাই চুয়াত্তরে দুর্ভিক্ষ লাগিয়েও যখন দেখল দেশের অগ্রগতি এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ঠেকানো গেল না, তখনই পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করল। আগেই বলেছি, শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু খুনি মোশতাক-জিয়ার চররা আজও তৎপর। শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ১৯ বার হামলা করা হয়েছে– চট্টগ্রাম, নাটোর, জামালপুর, ৩২ নম্বরের বাসভবন, রাসেল স্কোয়ার, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ– কিন্তু আল্লাহর রহমতে তিনি বেঁচে আছেন এবং জাতিরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। ভাড়াটিয়া খুনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ফারুক যেমন টিভিতে ইন্টারভিউ দিয়ে জিয়ার সম্পৃক্ততা স্বীকার করেছে, তেমনই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মুফতি হান্নান বলেছে, হাওয়া ভবনে তারেকসহ বসে কীভাবে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে হামলা করা হয়েছে, যাতে নারী নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৩ জন নেতাকর্মী On the spot নিহত হয়েছেন এবং তিন শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। ঢাকায় তখনকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, আবদুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত গ্রেনেডের স্প্লিন্টার বয়ে আলটিমেটালি ইন্তেকাল করেন। আজও অনেকে শরীরে স্প্লিন্টারের যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছেন। চক্রান্ত শেষ হয়ে যায়নি। আজও সরকারের কাছাকাছি ঘাপটি মেরে আছে। আমরা যেন না ভুলি– বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব যেমন ছিল অপ্রতিরোধ্য, তেমনই শেখ হাসিনাও আজ বিশ্বের প্রথম কাতারের রাষ্ট্রনেতা। সদা সতর্কতা জরুরি।

**লেখক: সংসদ সদস্য, সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব**


**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

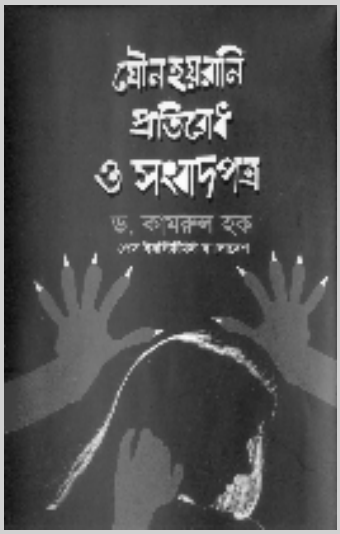


**যোগাযোগ**
**প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ**
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
**৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা**

# বিশ্বমহামারিতে বঙ্গবন্ধুই আমাদের শক্তি

**স্বদেশ রায়**

বিশ্বমহামারির এক ভয়াবহ অবস্থানে আমরা দাঁড়িয়ে। যে যা-ই বলি না কেন, ভবিষ্যৎ এখনো সবার কাছেই অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট। শুধু আমরাই নই, গোটা বিশ্বই এখনো জানে না বর্তমানের এই অবস্থা থেকে কবে এবং কীভাবে মুক্তি পাবে মানুষ।

তারপরও ইতোমধ্যে বেশকিছু বিষয় বিশ্বে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আমাদের ক্ষেত্রেও অনেক বিষয় এখন স্পষ্ট। আমরা এখন সবাই বুঝতে পারছি এই বিশ্বমহামারিকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হলে বা মহামারির ক্ষতকে সারিয়ে তুলতে হলে আমাদের কী কী প্রয়োজন। পাশাপাশি আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে– উন্নয়ন ও সভ্যতা যতই এগিয়ে যাক না কেন, সেটা বিপন্মুক্ত নয়। যে কোনো সময়ে যে কোনো ধরনের আঘাত আসতে পারে এই উন্নয়ন ও সভ্যতার ওপর এবং তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সত্যি অর্থে পৃথিবী এখনো অর্জন করেনি। তাই একটি দেশ, জাতি বা একটি সভ্যতাকে এমনভাবে গড়ে উঠতে হবে, যাতে যে কোনো বড়ো ধরনের আঘাতকে সহ্য করেও টিকে থাকতে পারে। এটা শুধু আমাদের মতো দরিদ্র দেশের জন্য নয়, পৃথিবীর সভ্যতার জন্যই দরকার। আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই– হাজার হাজার বছরের নানা সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে। সাধারণ দুর্যোগ এবং ভয়াবহ দুর্যোগ পৃথিবীতে আসবেই। এটি মনে রেখেই আমাদের সভ্যতাকে গড়ে তুলতে হবে। এবারের বিশ্বমহামারিতে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে– আধুনিক রাষ্ট্র ও সভ্যতাগুলো বড়ো বেশি মনোযোগ দিয়েছে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ ও রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সামরিক কৌশল প্রতিরোধের দিকে। তারা প্রকৃতির নির্দয়তার কথা অনেকখানি ভুলে গিয়েছিল। তাদের কিছুটা

হলেও ধারণা জন্মেছিল তারা প্রকৃতিকে জয় করেছে। অর্থনৈতিক ও সামরিক উন্নয়নের জৌলুসে সভ্যতার অতীতের দার্শনিকদের কথাও তারা ভুলে গিয়েছিল বলেই মনে হয়। যে চীন থেকে এই মহামারির সৃষ্টি, তাদেরই দার্শনিক 'তাও' প্রায় দুই হাজার বছর আগে স্পষ্ট করে বলে গেছেন, 'প্রকৃতি নির্দয়। সে তোমাকে যে কোনো মুহূর্তে পুজো শেষে খড়কুটোয় তৈরি মূর্তির মতোই ফেলে দেবে।' প্রকৃতির এই ভয়াবহ চরিত্র দুই হাজার বছর আগে চীনের মানুষের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হলেও তারা যে সেটা ভুলে গিয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এবারের কোভিড-১৯ এর সময়। প্রকৃতির এই আঘাতের জন্য তাদের সচেতন কোনো প্রস্তুতি ছিল না। এমনকি আঘাতটি আসছে বা কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি জানার পরও তাদের প্রতিরোধ করার কাজে নামতে সময় লেগেছে ১৯ দিন। এই ১৯ দিন সময় যদি তাদের নষ্ট না করতে হতো, তাহলে হয়তো পৃথিবীর এই অবস্থা হতো না। হয়তো কোভিড-১৯কে খুব ছোটো পরিসরে রেখেই পৃথিবী মোকাবিলা করতে পারত। এখন এটা আরও স্পষ্ট, এই অবস্থা গোটা পৃথিবীরই। কেউই প্রস্তুত ছিল না প্রকৃতির এই ধরনের নির্মম আঘাত মোকাবিলায়। প্রত্যেকেই সময় নষ্ট করেছে। অধিকাংশই ছোটো পরিসরে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে কোভিডকে আটকে রাখতে পারেনি। অর্থাৎ আগেই যে কথা বলেছি সেটাই প্রমাণিত হয়, আমাদের সভ্যতা ও উন্নয়ন শতভাগ টেকসই নয় মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রকৃতিসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে।

একবিংশ শতাব্দীতে এই বিশ্বমহামারির পর নিশ্চয়ই প্রতিটি দেশকে, প্রতিটি মানবগোষ্ঠীকে সচেতন হতে হবে নতুন করে। যার যার অবস্থানে থেকে এবং নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক অনুযায়ী কীভাবে টেকসই একটি সভ্যতা ও উন্নয়ন গড়ে তোলা যায়, সে পথই খুঁজতে হবে। যাতে যে কোনো ধরনের প্লেগ মোকাবিলা করে বা কখনো কখনো দুর্যোগকে সঙ্গে নিয়ে টিকে থাকতে পারবে সভ্যতা ও মানুষ। আর এক্ষেত্রে এই পথটি খুঁজতে হবে প্রতিটি দেশ বা সমাজকে তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে। যেমন– আমাদের ওপর কী কী আঘাত এসেছে, সেগুলো আগে চিহ্নিত করতে হবে। যেহেতু এবারের দুর্যোগটি একটি ভয়াবহ রোগ, তাই এর প্রথম আঘাতটি এসেছে স্বাস্থ্যের ওপর। স্বাস্থ্যের ওপর আঘাত মোটা দাগে ভাগ করলে দেখা যায় দুই ধরনের– এক. চিকিৎসা এবং দুই. স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত আমাদের জীবনাচরণ। এবারের মহামারির কারণ করোনাভাইরাস, যা একেবারে নতুন। কিন্তু বাস্তবে কি শতভাগ নতুন? কারণ, কোভিড-১৯ মূলত সার্স-২। সার্সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ আক্রান্ত হয়েছিল ২০০৪ সালে। এই কোভিড-১৯ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সার্স মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা যে কাজে লেগেছে, এর প্রমাণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ। যেমন– সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া বেশ সফলভাবে সার্স-২ অর্থাৎ কোভিড-১৯ মোকাবিলা করেছে। তারা শুরু থেকে যথেষ্ট সঠিক চিকিৎসা দিতে সমর্থ হয়েছে।

সার্স আমাদের দেশে আসেনি; কিন্তু আমরা যদি সচেতন ও দূরদর্শী হতাম, সর্বোপরি প্রকৃতির আঘাত সম্পর্কে সচেতন থাকতাম, তাহলে আমাদের কাজের ধরন ভিন্ন হতো। নিঃসন্দেহে সার্স সম্পর্কে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতাম বা যথেষ্ট ধারণা রাখতাম। আর এটা যদি আমরা করতাম, তাহলে হয়তো আমাদের এত ডাক্তারের মৃত্যু হতো না। এর থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট– আমরা দৈনন্দিন চিকিৎসা নিয়েই ব্যস্ত। ভবিষ্যৎমুখী বা পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে স্বাস্থ্য নিয়ে যে বিপত্তি ঘটছে, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নই। এখানে অবশ্য অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন– পাশ্চাত্যের অনেক উন্নত দেশের অবস্থা আমাদের থেকেও খারাপ। সেটা স্বীকার করেই বলছি, তাদের থেকে অনুন্নত ও দরিদ্র হলেও ভিয়েতনামের মতো সচেতন একটি দেশ ও জাতি হওয়া উচিত ছিল আমাদের। এই মহামারিতে আমাদের স্থান ভিয়েতনামের পাশাপাশি থাকা উচিত ছিল। কেন উচিত ছিল, এ বিষয়ে পরে আসছি। এরপর আসছে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত আমাদের জীবনাচরণ। এই কোভিড-১৯ মহামারির ভেতর দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা অত্যন্ত নিম্নমানের। অথচ এর বিপরীতে আমরা অনেক বেশি স্বাস্থ্যসচেতন ও আধুনিক জীবনাচরণের অধিকারী হতে পারতাম। আমরা সামাজিকভাবে আধুনিক চিন্তাচেতনার অধিকারী হলে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে সফলতা আরও বেশি আসত। আমাদের সফলতা দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারতাম দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা একটি ভিয়েতনাম বা তার থেকে অনেক অগ্রসর।

এখন প্রথম প্রশ্ন আসে, কেন আমরা ভিয়েতনামের মতো হতে পারতাম? এর উত্তরে বলা যায়, ভারত বা পাকিস্তানের সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষের ধারা থেকে বের হয়ে এসে আমরা ভিয়েতনামের মতো বা তাদের থেকে অনেক বেশি সুশৃঙ্খল হতে পারতাম। আর তেমনটি হওয়ার জন্যই এ রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল সামাজিক জাগরণ ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। আসলে একটি জাতিগোষ্ঠী বা একটি রাষ্ট্রের নাগরিক কেন অন্যের থেকে বেশি সুশৃঙ্খল হয়? এর মূলে দেখা যায়, যে রাষ্ট্রের নাগরিকরা বা যে জাতিগোষ্ঠী যত বেশি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নিজেদের এগিয়ে নিয়েছে, সে জাতি তত বেশি সুশৃঙ্খল ও আধুনিক। একটি জাতিগোষ্ঠীর বা রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে এই বিপ্লব প্রবাহিত হয় কোনো এক মহান নেতার বা মানবসভ্যতার পরিবর্তনকারী নেতার (গেম চেঞ্জার) হাত ধরে। বাঙালি জাতির সৌভাগ্য হয়েছিল এমনই মানবসভ্যতা পরিবর্তনকারী বা এগিয়ে নেওয়া নেতার হাত ধরে রাষ্ট্র এবং বেশকিছুটা সমাজবিপ্লব ঘটানো। বাস্তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা যে স্বাধীনতার সংগ্রামটি করেছিলাম একে কোনো ছোটো পরিসরে দেখার সুযোগ নেই। একে যদি আমারা শুধু একটি সাদামাটা স্বাধীনতাসংগ্রাম হিসেবে দেখি, শুধু একটি সশস্ত্র যুদ্ধ হিসেবে দেখি, তাহলে অনেক বড়ো ভুল হবে। অথচ এই ভুল আমাদের মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে। আমরা আমাদের দীর্ঘ ও বিশাল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তনের বা বিপ্লবের বিষয়টিকে শুধু কিছু সশস্ত্র যুদ্ধের ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে উপলব্ধি বা বিচার করতে শুরু করেছি। ১৯৭৫-পরবর্তী রাষ্ট্র আমাদের সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিকে সেই ধারায় প্রবাহিত করেছে। অথচ এই রাষ্ট্র ও সমাজ সৃষ্টির জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে দীর্ঘ পথচলা, সেটা ছিল একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের লক্ষ্যে এবং একটি ধারাবাহিক সামাজিক বিপ্লবের সূচনা। বাস্তবে সামাজিক বিপ্লবের ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব হয় আবার ওই রাষ্ট্রই সামাজিক বিপ্লবকে প্রবহমান থাকতে সাহায্য করে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বা রাষ্ট্রবিপ্লবে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের এই ঐক্য ও আধুনিক রাষ্ট্রচাহিদাটি একদিনে আসেনি। কারণ আমরাই (পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী) ছিলাম পাকিস্তান নামক পশ্চাৎপদ শতভাগ অতীতমুখী দর্শনের একটি রাষ্ট্র সৃষ্টির মূল নায়ক। আমাদের এই চিন্তার জগৎকে ২২ বছরের ধারাবাহিক আন্দোলন ও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে ১৯৭১-এর পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাস্তবে এই পরিবর্তনটি কী? আমরা অতীতমুখী থেকে আধুনিক হয়েছিলাম। আমরা তথাকথিত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের কূপমণ্ডূকতা থেকে বা অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তা থেকে

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আধুনিকতায় সমাজের একটি বড়ো অংশের মানুষকে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। আর এই নিয়ে যাওয়ার নেতৃত্বই শুধু দেননি বঙ্গবন্ধু, তিনি এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের শিখাটি আমাদের প্রাণে প্রাণে জাগিয়েছিলেন। মানবসভ্যতায় মানুষের চেতনার দিক পরিবর্তনকারী এই যেসব নেতা আসেন, তাঁরা সব সময়ের জন্য বিশ্বনেতা। কারণ, মানুষের এই পরিবর্তন কোনো একটি ভূখণ্ডে আটকে রাখা যায় না। আর বঙ্গবন্ধু বাঙালি নরগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, তাকেও শুধু ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উত্তরণ হিসেবে দেখলেও ভুল হবে। বঙ্গবন্ধু একটি নরগোষ্ঠীকে আধুনিকতার পথে, আত্মশক্তিতে চলার পথে তুলে দিয়েছিলেন। এর প্রভাব পড়ে সারা বিশ্বে।

এই আধুনিকতার বা আত্মশক্তিতে চলার পথটি কখনোই শুধু তাত্ত্বিক ও মনোজাগতিক বিষয় নয়। এর প্রায়োগিক দিকও আছে। যেমন আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বমহামারি এসে আমাদের সব থেকে বেশি আঘাত করেছে স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির খাতে। আর এই আঘাত প্রতিরোধে অন্যতম একটি বাধা আমাদের চরিত্র ও মনোজগৎ। অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে এই তিনটিকে– অর্থাৎ স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও মনোজগৎকে টেকসইভাবে পরিবর্তনের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। প্রথমেই স্বাস্থ্য খাত ধরা যাক। বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনায় দেখা যাচ্ছে, তিনি শুধু রাজধানীকেন্দ্রিক সরকারি উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং বেসরকারির নামে বিশাল অর্থব্যয়ের এই চিকিৎসাব্যবস্থার ধারার প্রবর্তক নন। তাঁর পরিকল্পনায় ছিল প্রতিটি থানাভিত্তিক উন্নত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে তিনি অতি সহজে আমাদের আরও অন্তত ২০ বছর নেতৃত্ব দিতে পারতেন। বঙ্গবন্ধু আরও ২০ বছর নেতৃত্ব দিলে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করলে আমাদের থানাভিত্তিক স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো শুধু প্রতিষ্ঠিত হতো না, সেগুলো উন্নতমানের হতো। সেগুলোয় আধুনিক সব পরীক্ষানিরীক্ষা এবং মোটামুটি অনেক গবেষণার সুযোগ থাকত। আর এটা যখন পরিপূর্ণ হতো, তখন আমাদের স্বাস্থ্য কাঠামো একটি টেকসই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যেত। আর বঙ্গবন্ধু যেহেতু প্রতিমুহূর্তের সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে আসতেন, তাই আর যাই হোক আমরা বর্তমানে যেমন একটি দুর্নীতিবাজ, অসৎ ও অনেকখানি চরিত্রহীন জাতি– এমন জাতি বা নরগোষ্ঠী হতাম না। আমাদের শিক্ষিত সমাজ ও নেতৃত্বদানকারী সমাজ– যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে নেতৃত্ব দেন, তাদের চরিত্র বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের অনুকরণে নির্মল চরিত্রই হতো। কারণ, বঙ্গবন্ধুর মতো অতিমানব যখন কোনো নরগোষ্ঠীর নেতৃত্বে থাকেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় তাঁর চরিত্রের আলোকরশ্মি সাধারণের মধ্যে প্রতিটি কাজের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে আমাদের সেটা ঘটত। তাই তাঁর পরবর্তী সময়ে যারা দেশ ও সমাজ পরিচালনা করতেন, তারা সবাই তাঁর আদর্শ অনুযায়ী নির্মল সচ্চরিত্রের হতো। ফলে যে দীর্ঘ দুর্নীতির ধারা বাংলাদেশে চলে আসছে, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর থেকে এই দুর্নীতির প্রবেশ সমাজ ও রাষ্ট্রে ঘটত না। আর ৪৫ বছর সৎ নেতৃত্ব, সৎ নাগরিকের হাত বেয়ে যদি প্রত্যেকটি থানায় এই আধুনিক স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো গড়ে উঠতে পারত, তাহলে আজ কি আমরা ভিয়েতনামের মতো এক মাসের বা তার থেকেও কম সময়ে সারাদেশের মানুষের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করে কে আক্রান্ত আর কে আক্রান্ত নন, এটা শনাক্ত করে ফেলতে পারতাম না? আর প্রথম এক মাসের মধ্যে এটা করতে পারলে আমাদের কোভিড আক্রান্তের হার কমে গিয়ে অতি সীমিত আকারের মধ্যে কি সীমাবদ্ধ হতো না? আর এ কাজের ভেতর দিয়ে আমরা কি ভিয়েতনামের মতো বা তার থেকেও সফলভাবে কোভিড-১৯কে শুরুতে আটকে দিতে পারতাম না? অবশ্যই পারতাম। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে আমাদের লোকসংখ্যাও কম থাকত। কারণ, তিনি নিঃসন্দেহে সমাজ থেকে পশ্চাৎপদতা দূর করতেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি ১৯৪৮ থেকে প্রতিটি মুহূর্তে কাজ করে গেছেন। তাই তিনি বেঁচে থাকলে ১০ বছরেই আমরা একটি আধুনিক সমাজ পেতাম। আর একটি আধুনিক সমাজ নিশ্চয়ই এমন অপরিকল্পিত ও ভাগ্যবাদীদের মতো সন্তান জন্ম দেয় না। বরং বঙ্গবন্ধুর শক্তিতে একটি পরিকল্পিত পরিবারের সমাজই গড়ে উঠত। আর সেটা গড়ে তোলার সব শক্তি, সব আধুনিকতা তাঁর ভেতর ছিল। একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু স্বাস্থ্যের যে অবকাঠামো গড়তে চেয়েছিলেন, সেটা যদি হতো আর তাঁর আদর্শে পরিকল্পিত পরিবার হলে আজকের চিত্র ভিন্ন হতো। অর্থাৎ বর্তমানের থেকে অনেক কম জনগোষ্ঠীর এই রাষ্ট্র ও সমাজটি থাকত। আর তা হলে আমরা কি ভিয়েতনামের থেকেও ভালো পারদর্শিতা এই স্বাস্থ্য খাতে বিশ্বমহামারিকালে দেখাতে পারতাম না!

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে তিনি অতি সহজে আমাদের আরও অন্তত ২০ বছর নেতৃত্ব দিতে পারতেন। ... রাষ্ট্র পরিচালনা করলে আমাদের থানাভিত্তিক স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো শুধু প্রতিষ্ঠিত হতো না, সেগুলো উন্নতমানের হতো

বিশ্বমহামারি স্বাস্থ্যের পরেই আঘাত করেছে অর্থনীতিতে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে বা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থনীতির সব জায়গায় আঘাত করতে পারেনি। শহরকেন্দ্রিক শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আঘাত করেছে। এখন ভেবে দেখা যেতে পারে, আজ যদি এই দেশে বঙ্গবন্ধুর চিন্তার অর্থনৈতিক কাঠামো বাস্তবায়িত হতো অর্থাৎ গ্রাম ও শহর প্রায় সমমানের হিসেবে তৈরি করা হতো, তাহলে কি এই আঘাত এভাবে লাগতে পারত? পারত না। এই বিশ্বমহামারিতে সব থেকে বেশি অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত। এই সংকটে পড়ার বড়ো কারণ তাদের আয়ের বড়ো অংশই ব্যয় হয়ে গেছে বড়ো বড়ো শহরে বাসাভাড়ায়। তারা সঞ্চয় করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ পরিকল্পনা যদি এ দেশে বাস্তবায়িত হতো, তাহলে মানুষকে উন্মূল হওয়ার প্রয়োজন হতো না। নিজ নিজ বাসস্থানে থেকে অধিকাংশ মানুষই তাদের কাজের স্থানে যেতে পারত, সন্তানকে যথার্থ শিক্ষা দিতে পারত, সর্বোপরি তার গ্রামের নিজস্ব সম্পদটুকু সঠিক ব্যবহার করতে পারত। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর চিন্তাচেতনা থেকে সরে এসে ধীরে ধীরে যে অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক

ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, তা মূলত কয়েক ব্যক্তির জন্য, একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য– দেশের সাধারণের কথা চিন্তা করে নয়। তাছাড়া শত চেষ্টা করলেও বর্তমানের এই ব্যবস্থায় দেশের অধিকাংশ মানুষের যোগ ঘটানো যায় না। অথচ বঙ্গবন্ধুর যে গ্রামভিত্তিক অর্থনীতির চিন্তা ছিল, সেটা বাস্তবায়িত হলে দেশের অর্থনীতির কাঠামো ভিন্ন হতো। যেমন– আজ যদি কৃষি ও কৃষিজাত শিল্প পাশাপাশি এবং ছোটো ছোটো আকারে থাকত, তাহলে কি ছবি ভিন্ন হতো না? তাহলে দেশের অনেকসংখ্যক মানুষ শিল্পের উদ্যোক্তা হতো। আবার মোট কৃষিজাত শিল্পপণ্যের উৎপাদনও বেশি হতো। এই বিশ্বমহামারি সেই শিল্পকে আঘাত করতে পারত না। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এই আধুনিক দাসপ্রথার শ্রমশোষণের পোশাকশিল্প গড়ে উঠত না। এ ধরনের রফতানি পণ্যের শিল্পগুলো দেশব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তৈরি হতো। ফলে উন্মুল শ্রমিকগোষ্ঠী গড়ে না উঠে একটি পরিবারকে সচ্ছল করার শ্রমিকগোষ্ঠী গড়ে উঠত। তাছাড়া শ্রমের মূল্য অনেক বেশি পেত বাংলাদেশের শ্রমিকরা। এখন যে শিল্পের মাধ্যমে কানাডায় 'বেগমপাড়া' বা মালয়েশিয়ায় 'সেকেন্ড হোম গড়ে' উঠছে মালিকদের, এর বদলে তারা বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিবর্তনের একেকজন ব্যক্তি হয়ে উঠতেন। শ্রমিকরাও পেত উন্নত জীবন। আর নিশ্চয়ই এই বিশ্বমহামারিতে কর্মহীন হতে হতো না হাজার হাজার পোশাক শ্রমিককে। ভিয়েতনামে কিন্তু কর্মহীন হতে হয়নি কাউকে। বঙ্গবন্ধু শুধু শহরকেন্দ্রিক না করে সমগ্র দেশকে নিয়ে অর্থাৎ গ্রাম ও শহরভিত্তিক টেকসই অর্থনীতি গড়ার জন্যই তিনি তাঁর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করেছিলেন।

সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করা হলে আমাদের জাতীয় চরিত্র এভাবে নষ্ট করার সুযোগ পেত না সামরিক শাসকরা। আমাদের সমাজে সবক্ষেত্রে এমন অনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠত না। পশ্চাৎপদ মধ্যযুগীয় চিন্তাচেতনা জেঁকে বসার সুযোগ পেত না এ সমাজে। কারণ, বঙ্গবন্ধুই ১৯৪৮ থেকে ধীরে ধীরে মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশের একটি বড়ো অংশের মানুষকে, বড়ো অংশের তরুণ সমাজকে আত্মত্যাগী, সৎ ও নির্ভীক হয়ে ওঠার পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যদি রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ন্ত্রক হিসেবে আরও ২০ বছর থাকতে পারতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় চরিত্রের আরও অনেক পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন। তাতে আজ যেসব ক্ষেত্রে, সব মূল্যবোধ বিসর্জন দেওয়ার একটি স্রোত সমাজে বয়ে চলেছে, এটি সৃষ্টি হতে পারত না। এর বিপরীতে একটি স্বচ্ছ ও সৎ স্রোতধারা তৈরি হতো সমাজে। তাহলে আজ এই মহামারির সময়ে স্বাস্থ্য খাতে দুর্বলতা, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক খাতের দুর্বলতা এবং দুর্নীতি বের হতো না। বরং দেখা যেত নিষ্ঠার সঙ্গে, বীরত্ব দিয়ে, সততা দিয়ে আমরা এটি মোকাবিলা করছি। এই মহাদুর্যোগে আমাদের সবার ভেতর কিছু না কিছু বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের ছাপ ফুটে উঠত। আর ওই চরিত্রই বিশ্বমহামারির সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করার শক্তি দিত। তাই বিশ্বমহামারি মোকাবিলায় সত্যি অর্থে মূল অস্ত্র রয়েছে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের ভেতর। তার ভেতর থেকে প্রকৃত শক্তি খুঁজে নিয়েই আমাদের বর্তমান সময়ের এই বিশ্বমহামারি রুখতে হবে। তাঁর এই জন্মশতবর্ষে শাহাদতবার্ষিকী পালন মানে কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়। তাঁর এই নিহত হওয়ার দিন, এই জাতীয় শোক দিবস পালন সঠিকভাবে করতে হলে তাঁর চরিত্রই এ জাতির প্রত্যেককে নিজ চরিত্রে ধারণ করতে হবে। যাতে সেই চরিত্রের বলে এই দুঃসময়ে নিজ নিজ অবস্থানে শতভাগ সততার সঙ্গে সঠিক কাজটি করতে পারে। যদি আমাদের সমাজ ও সভ্যতাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে কোনো বিশ্বমহামারিতে আমাদের এমন অসহায় হতে হবে না। আমরা স্মরণ করতে পারি, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে কিন্তু এখনো আমরা ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগকে সাধারণভাবেই মোকাবিলা করে যাচ্ছি। তাই এই বিশ্বমহামারিতেও তিনিই আমাদের ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। আমাদের নিজ নিজ চরিত্র, জাতীয় চরিত্র তৈরি, দুর্নীতিসহ সব অপরাধ থেকে নিজেদের বের করে আনতে হলে বঙ্গবন্ধুর চরিত্র থেকেই পথনির্দেশিকা নিতে হবে। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে, তাঁর নির্মম মৃত্যুদিনে এই আত্মোপলব্ধি যেন সবাই করি– এটাই হোক প্রার্থনা।

**লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সিনিয়র সাংবাদিক**

**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

**যোগাযোগ**
**প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ**
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
**৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা**

# ১৯৭৫-পরবর্তী দিনগুলোর দুঃসহ স্মৃতি এবং বঙ্গবন্ধুর কথা

**অধ্যক্ষ শেখ আবু হামেদ**

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সকালে রেডিয়োতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে– এ মর্মে ডালিমের ঘোষণা শুনে কালীকচ্ছ বাজারে যাই। সেখান থেকে বারবার একই কথা শুনে মর্মাহত হয়ে গৃহে ফিরি। তাৎক্ষণিকভাবে তখন কিছু বুঝিনি, পরে ধীরে ধীরে বুঝতে থাকি। এর কিছুদিন আগে আর্থিক ও নানা কারণে সরাইল কলেজ বন্ধ করে দিয়ে পুনরায় শাহবাজপুর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেছিলাম।

উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালে সরাইল কলেজে চলে আসার সময় আমি স্কুলের বিএসসি বিএড শিক্ষক অরুণোদয় দত্ত বাবুকে এর ভার দিয়ে এসেছিলাম। চুয়াত্তর সালে অরুণোদয় চলে যাওয়ার পর পদটি শূন্য ছিল। কুমিল্লা বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত কন্ট্রোলার (পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক) শাহবাজপুরের আবদুল আউয়াল ওই মুহূর্তে স্কুলের রেক্টর হিসেবে ছিলেন। এর আগে অবশ্য ১৯৪২ সালে তিনি প্রথম জীবনে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। যাই হোক, ১৫ আগস্টের দুর্ভাগ্যজনক ও কলঙ্কজনক ঘটনা শোনার পর গ্রামের মানুষ ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রতিকারের লক্ষ্যে তখন আমাদের কিছু করার ছিল না বলে নীরব ভূমিকা পালন করি। বাড়ি থেকে সরে গিয়ে আমার গ্রামের বাড়ি আঁখিতারায় গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এসেছিলাম। আজ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হওয়ায় বাংলাদেশের সব অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়েও বাংলাদেশের জাতির পিতার ছবি টাঙানো দেখে আনন্দভরা মন নিয়ে বেঁচে আছি।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ের দুঃসহ দিনগুলো আজও মনে পীড়া দেয়। ১৯৭৬ সালে সাপ্তাহিক খবর পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর নাম

উল্লেখ করে এমএজি ওসমানীর একটি উক্তি প্রকাশিত হয়েছিল। আমি কুমিল্লার কান্দিরপাড় থেকে পত্রিকাটি কিনে এনেছিলাম। কালীকচ্ছ বাজারে বঙ্গবন্ধুর ভক্ত মরহুম আবদুল আলিমের ছেলে আবদুর রহিমকে (বর্তমানে নোয়াগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা) পত্রিকাটি দেখালে সে আঁতকে উঠেছিল। কারণ, ওইসময় বঙ্গবন্ধুর নাম নেওয়া ছিল ভয়ের ব্যাপার। আমি তখন চিৎকার করে বলেছিলাম, বঙ্গবন্ধুর নাম একশবার বলব, হাজারবার বলব। যিনি বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছেন, যিনি বাংলাদেশ করেছেন, তাঁর নাম উচ্চারণ করব না কেন? এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে ছাত্রলীগ নেতা আল মামুন সরকার (পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর চেয়ারম্যান) ১৫ আগস্ট এলে অনুষ্ঠান করত। এতে আমি আমন্ত্রিত হতাম।

১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হয়ে একদিন সিলেট থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসছিলেন গাড়ির বহর নিয়ে। শাহবাজপুর মাদরাসার মসজিদের পশ্চিমে মুক্তিযোদ্ধা তামান্নাদের বাড়ির সামনে সিএন্ডবির রাস্তায় (যেখানে উনসত্তর সালে সিলেট যাওয়ার পথে বঙ্গবন্ধুও দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছিলেন) জিয়াউর রহমান গাড়ি থেকে নেমে আমার সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আমি আমার হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম। কারণ, দেশের ক্ষমতা গ্রহণ ও রাজনীতিতে তার ভূমিকায় আমার চরম ক্ষোভ ছিল। সেদিন অনেকে অবশ্য তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।

এরপর দেশে সামরিক শাসনের মধ্যে ঘরোয়া রাজনীতি চালু হলে সরাইল-কালীকচ্ছ এলাকায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সংগঠন আওয়ামী লীগকে আবারও সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। এ সময় বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে সরাইল-কালীকচ্ছে পথসভা ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হতো। বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলোয় সংকলন প্রকাশিত হতো। এ সময় এসব কাজে যাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তারা হলেন বড়ো দেওয়ানপাড়ার জুনায়েদউদ্দীন ঠাকুর, সরাইলের আশরাফ আহম্মদ, কাটানিসারের আবদুল হালিম (বর্তমানে থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি), ছৈয়দটোলার কাজী মফিজুল ইসলাম দুধ মিয়া মাস্টার, সূর্যকান্দির ওসমান গণি, আবু আহম্মদ মৃধা, শেখ আহমাদুর রহমান, আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ মোবাররাম আহসান (বর্তমানে আশুগঞ্জ সার কারখানার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) ও শেখ মোতাহার হোসেন, কালীকচ্ছের জয়দুল হোসেন লস্কর, হারুন লস্কর, সিরাজুল হক মৃধা, মুজিবুর রহমান ও ভাস্কর নন্দী (সরাইল থানা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত হীরালাল নন্দীর পুত্র), ধর্মতীর্থের মাহবুবুর রহমান ও হুমায়ুন হোসেন, আঁখিতারার শেখ ছাদেক মিয়া এবং নোয়াগাঁওয়ের আবু সোলায়মান ও আবদুর রহিম।

১৯৭৮ সালের ১৭ মার্চ কালীকচ্ছ কমিউনিটি হলের সামনে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন আবদুল হালিম, জুনায়েদউদ্দীন ঠাকুর, আশরাফ আহম্মদ প্রমুখ। সভামঞ্চে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি রাখা ছিল। সভাপতির ভাষণে আমি বলেছিলাম, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট কেউ ভুল করে যদি 'ইন্নালিল্লাহ' বলে না-থাকেন, তবে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। 'ইন্নালিল্লাহ' পড়ে নিজেকে সংশোধন করুন। জনতার অনেককেই দেখলাম 'ইন্নালিল্লাহ' উচ্চারণ করছেন। তারপর জাতির পিতার কর্মকাণ্ডের ওপর বক্তৃতা করেছিলাম। ভাষণের শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার-পরিজনের শহিদি আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেছিলাম। জনতা হাত তুলে মোনাজাতে অংশ নিয়েছিলেন। এসব স্মৃতি নিয়েই আজকাল থাকি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ১৯৭৬-৭৭ সালের দিকে একদিন শাহবাজপুর স্কুলে জিয়াউল আমিন নান্না মিয়া (পাকিস্তান আমলে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি) আমাকে এসে বললেন, 'তোমার নাম তো তালিকাভুক্ত, তোমার কি ভয় করে না?' আমি বলেছিলাম, ভয় আমি করি না, ভয় করে তো কোনো লাভও নেই। এর পরদিন কে যেন আমাকে বলেছিল, শাহবাজপুর সিএন্ডবি রাস্তায় একজন সরকারি কর্মকর্তা আমাকে ডেকেছেন। আমি বলেছিলাম, ওকে বলো আমার এখানে আসতে। সেদিন অবশ্য কেউ আসেনি, আমিও খোঁজ করিনি। সম্ভবত তদানীন্তন সরকারের কোনো ব্যক্তি ছিল এই লোক। আমি বুঝেছিলাম, নান্না মিয়ার বাড়িতে তাদের যাওয়া-আসা ছিল। তিনিই সম্ভবত ওদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। ... 'ইন্নালিল্লাহ' পড়ে নিজেকে সংশোধন করুন। জনতার অনেককেই দেখলাম 'ইন্নালিল্লাহ' উচ্চারণ করছেন

শাহবাজপুরের আরও অনেক স্মৃতিই আছে। '৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার খবর যেদিন পত্রিকায় এলো, সেদিন নান্না মিয়া আমাকে ডেকে নিয়ে পত্রিকা দেখালেন আর বললেন, 'এ যাত্রায় শেখ মুজিব আর রেহাই পাবে না।' আমি বলেছিলাম, 'শেখ মুজিব মহান নেতা হবেন, জাতির পিতা হবেন। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার এত সাহস!' আমি বলেছিলাম, সাহস নিয়েই তো চলি পৃথিবীতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নান্না মিয়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের সাবেক কৃষি প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাবেক সভাপতি রাশেদ মোশাররফ ও পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার ধারাবাহিকতায় নিহত ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সমরনায়ক ও কীর্তিমান পুরুষ শহিদ মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের আপন ভগ্নিপতি ছিলেন। নান্না মিয়ার নানা ছিলেন কুখ্যাত নুরুল আমিনের পিতা চুন্নু মিয়ার আত্মীয়। পাকিস্তান আমলে করাচিতে নুরুল আমিনের পরিচয়েই সম্মানিত হতেন নান্না মিয়া। এ কারণেই শ্যালকরা শেখ মুজিবের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও তার ভূমিকা ছিল শেখ মুজিববিরোধী। নান্না মিয়ার স্ত্রী আমাকে তার ভাই খালেদ মোশাররফের নিহত হওয়ার দিনের ঘটনাবলি সবিস্তার বর্ণনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন আমার ভাবি। নান্না মিয়ার বাবা মরহুম

আবদুল লতিফ ছিলেন একজন পুলিশ অফিসার, মূলত সরাইল থানার পানিশ্বরের লোক। তাঁদের পানিশ্বরের বংশের সঙ্গে আমাদের বংশের আত্মীয়তা ছিল আদিকাল থেকেই।

৩১ মে ১৯৬৯। আমি বর্তমান বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ অফিসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল তালশহরের অধিবাসী এবং আওয়ামী লীগ সংগঠক আবুল বাশার মৃধা ও কামাউড়ার মাহবুবুল হুদা ভূঁইয়া (পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গণমানুষের নেতা ও পৌর চেয়ারম্যান। সেদিন বঙ্গবন্ধু আলাপচারিতায় বলেছিলেন, 'চাচাতো বোন বিয়ে করেছি, চাচার একমাত্র সন্তান– সেই সম্পত্তি পেয়েছি। আমি সারাজীবন জেল খাটলাম, দিব্যি খাটলাম। বাড়িঘরের কোনো চিন্তা করতে হয়নি। আপনি আমার বদনাম করবেন না। আমার হাতে যাদের রাজনীতির হাতেখড়ি হয়েছে তারা আজ আমার বদনাম করে। এদেশ শোষণ করে এরা (পাকিস্তানিরা) এত টাকা নিয়ে গেছে যে, ওদের দেশ বিক্রি করে দিলেও তা পরিশোধ হবে না। আমাকে তো আজ গভর্নরের টোপও দেওয়া হয়।' আমি বলেছিলাম, গভর্নর হলে যে সালাম পাবেন, তার লাখ লাখ গুণ সালাম আজ সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আপনাকে দিচ্ছে। আপনি সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মনের মানুষ, 'বঙ্গবন্ধু'। এ সময় তোফায়েল আহমেদ (তৎকালীন ছাত্রনেতা) এসেছিলেন। তিনি তাকে চুপ থাকতে বলে বললেন, 'আমি একজন খানদানি আওয়ামী লীগারের সাথে কথা বলছি।' এর আগে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি নোয়াখালীর মোহাম্মদ উল্লাহ (পরবর্তীকালে একপর্যায়ে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হন) আমাদের চা পানে আপ্যায়িত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপের একপর্যায়ে জামায়াতের মওদুদীর প্রসঙ্গ উঠেছিল। আমি তাঁকে বলেছিলাম, মওদুদীর ইসলাম আমেরিকান ইসলাম।

তিনি খুশি হলেন, আমাকে হাত ধরে ৩২ নম্বরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করে বের হলেন। আমরাও বের হলাম। আমি তাঁকে পরে আসব বলেছিলাম। ওইসময় সামনে এলো একটা গাড়ি। খুব সম্ভবত আজকের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই গাড়িতে। আমরা চলে এলাম। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আমিই ছিলাম সরাইল আওয়ামী লীগ সভাপতি। ... এর আগে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে শাহবাজপুর খেলার মাঠে এক জনসভা হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলাম থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে। তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মাহবুবুল হুদা ভূঁইয়া ছিলেন প্রধান অতিথি। ছাত্রলীগ নেতা কুট্টাপাড়া গ্রামের মো. আবুবকর মজনু মিয়া, রবীন্দ্রমোহন নাগবাবুর পুত্র দীলীপ নাগ, নাসিরনগরের সায়েদুল হক (সাবেক মন্ত্রী) প্রমুখ বক্তৃতা করেছিলেন। চম্পা রানী নাগ কবিতা আবৃত্তি করেছিল। সভাপতির বক্তৃতায় আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে 'শেখে বাংলা' উপাধি দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম। এ কথাটি মাহবুবুল হুদা ভূঁইয়া সেদিন বঙ্গবন্ধুকে বলার পর তিনি হেসে বলেছিলেন, 'আমাকে যে নামেই ডাকা হোক, আমি বাঙালির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অর্জনের সংগ্রামে জীবনপাত করব।' এর কিছুদিন আগে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় ২০ লক্ষাধিক লোকের সভায় তিনি পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু উপাধি।

উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নুরুল আমিনকে সামনে রেখে গঠিত হয়েছিল আইয়ুববিরোধী সম্মিলিত বিরোধীদল (কপ)। সেই কপ-এর সভা হয়েছিল ঢাকার পল্টন ময়দানে। সেই সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবে সভাপতিত্ব করেছিলেন নুরুল আমিন। নুরুল আমিন তখন পাকিস্তানের রাজনীতিক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানকে নিয়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) করেছিলেন। তিনি ছিলেন এর সভাপতি। আওয়ামী লীগ অফিসে সেদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'নুরুল আমিন সাহেব জীবনে পল্টনে সভা করতে পারেননি। যাকে আমি সভাপতি করে সে সুযোগ করে দিয়েছিলাম সেই নুরুল আমিন এখন পইচ্মাদের (পশ্চিমাদের) কথায় চলে।' মুক্তিযুদ্ধকালে আমার কলকাতায় অবস্থানকালে নুরুল আমিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সংবাদ শুনে তাৎক্ষণিকভাবে লিখেছিলাম, 'ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে খুনি নুরুল আমিন' শীর্ষক একটি লেখা, যা কলকাতার বালু হাক্কাক লেন থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক জয়বাংলা' পত্রিকার শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এর আগেও আমার দেখা হয়েছিল। তিনি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' থেকে মুক্তি পেয়ে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পাওয়ার পর সিলেট যাচ্ছিলেন শাহবাজপুর দিয়ে। আমার বাসাও তখন শাহবাজপুরে। বঙ্গবন্ধু সরাইলেও সেদিন এক জনসভায় ভাষণ দেন। শাহবাজপুরনিবাসী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রবীন্দ্রমোহন নাগ (মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের বাল্যবন্ধু, বঙ্গবন্ধু এই নাগবাবুকে 'দাদা' ডাকতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন) আমাকে ঢাকা-সিলেট রাস্তার ওপরে বঙ্গবন্ধুকে নামিয়ে পথসভা করার অনুরোধ করেছিলেন। পথসভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জমে যায়। আমার বাসার সামনে তাঁর গাড়ি এলে আমি হাত নাড়িয়ে গাড়ি থামানোর অনুরোধ জানাই। তিনি জোরে বলেন, 'আমাকে কি নামতে হবে?' জি, আপনার নামতে হবে– আমার এ কথা শুনে তিনি নামলেন, আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। নাগবাবুর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'দাদা কেমন আছেন?' একটি ছোট্ট খাটের ওপর উঠলেন বঙ্গবন্ধু, দিলেন ছোট্ট একটি বক্তৃতা। আমি এ সময় তাঁর কানে কানে বললাম, এটা নুরুল আমিনের জন্মস্থান। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি বলে উঠলেন, 'বাজপাখি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন, আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন। সংগঠন করবেন, আওয়ামী লীগ করবেন। আমি আবার আসব, আমার সামনে মাইক থাকবে, কথা বলব। সিলেট যাচ্ছি, দোয়া রাখবেন। জয় বাংলা।' এই বলে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

তাঁর সঙ্গে সেদিন ছিলেন আবদুস সামাদ আজাদ (সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী)। এই সভার প্রারম্ভে আমার দ্বিতীয় পুত্র শেখ মোতাহার হোসেন বঙ্গবন্ধুকে মাল্যদান করেছিল। শাহবাজপুরের নেতৃবৃন্দও এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সভার পরে শাহবাজপুরের জনগণ 'বাজপাখি' বলতে বঙ্গবন্ধু কী বোঝাতে চেয়েছেন জানতে চাইলে আমি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, সম্ভবত তারা খুশি হয়েছিল।

এর কিছুদিন পর কুট্টাপাড়া গ্রামের প্রবীণ সরদার গোলাম রাব্বানীকে সভাপতি করে সরাইল থানা আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি গঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক করা হয় ডা. মোবারক আলী নীলু মিয়া ওরফে নীলু ডাক্তারকে। কিন্তু এ সময় ঘটে যায় একটি ন্যক্কারজনক ঘটনা। ঘটনাটি হলো, সত্তরের নির্বাচনে তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের টিকিটপ্রাপ্তিতে নাখোশ হয়ে নীলু ডাক্তার তার প্রার্থী সৈয়দ মোশারফ আলী যাদু মিয়াকে (পরবর্তীকালে খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বাধীন ডিএলএ'র ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার সভাপতি) নিয়ে একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সিলেট থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে কুট্টাপাড়ায় বঙ্গবন্ধুকে কালো পতাকা প্রদর্শনের আয়োজন করেছিল। আমি ওইসময় সরাইল কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আশীর্বাদ নিয়ে কলেজ চালাতে থাকি।

**লেখক: প্রয়াত শিক্ষাবিদ, ভাষাসৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠক**

# শেখ কামাল নয় টার্গেট বঙ্গবন্ধু

**পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন প্রতিদিনই দেখেছি শেখ কামালকে। দেখেছি নয়, দেখা হয়েছে। কলা ভবনের করিডরে, সোসিওলজি ডিপার্টমেন্টের জটলায়, মধুর ক্যান্টিনের চত্বরে, টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ায়, শরীফ মিয়ার চায়ের দোকানে, বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে, টিএসসির দোতলায় নাটকের রিহার্সেলে। কোনো না কোনো জায়গায় দিনে এক বা একাধিকবার দেখা হয়েছে। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে থাকা অনবদ্য এক যুবক। সাদামাটা মধ্যবিত্ত চেহারা। অথচ কী প্রাণবন্ত! বিশেষণবিহীন আকর্ষণীয় উজ্জ্বল বসনভূষণে, চালচলনে, আলাপচারিতায় তুমুল আড্ডায়। সতত সারল্যমাখা সহজিয়া চরিত্রের অমন মানুষ আমি অন্তত আমার জীবনে দেখিনি।

'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যরে লহ সহজে'– কবিগুরুর অমোঘ দর্শনের যথার্থ অনুসারী ছিলেন শেখ কামাল। জাতির পিতার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা অপবাদ শুনতে হয়েছে, শরীরে কাদা লাগানোর অপচেষ্টাও হয়েছে; কিন্তু শেখ কামাল নির্বিকার। অদৃষ্টকে হাস্য মুখে পরিহার করে বরং অধিকতর নিবিষ্ট হয়েছেন শুভ কর্মযজ্ঞে। একা নয়, বহুজনকে নিয়ে। বহুতর কর্মপরিকল্পনায়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্পেশাল ট্রেনিংয়ের প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শেখ কামাল স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে ফিরে এসেছিলেন নিজ ভুবনে। হাত দিলেন ক্রীড়া, সংগীত, নাট্য, শিক্ষা, সমাজ এবং তারুণ্যের রাজনীতি বিনির্মাণে। সেই সঙ্গে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় ও সুন্দরতর করা। পিতা স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সারাক্ষণ দেশ ও মানুষের কল্যাণে ব্রতী। সংসারের সর্বময় দায়িত্ব মাতা ফজিলাতুননেছা মুজিবের হাতে।

তাঁকে সহায়তা করতে পাঁচ ভাই-বোন সদা উদ্‌গ্রীব। এক অসাধারণ পবিত্র এবং সুখের আবহ ৩২ নম্বরের বাড়িময়। মাথার উপরে দেদীপ্যমান উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু– অথচ ৩২ নম্বরের বাড়ি শান্ত, স্নিগ্ধ, সুখী গৃহকোণ। প্রচলিত আছে, সূর্যের তাপ সহ্য করা যায় কিন্তু তপ্ত বালুর তাপ নাকি অসহনীয়। কিন্তু এই বাড়ির কারও চরিত্রেই সহ্যের রহিত তাপ নেই, অশোভন আচরণ নেই, ক্ষমতার অপব্যবহার নেই। শেখ কামালের চরিত্রে পরিবারের সুস্থ ও পবিত্র আবহের প্রভাব তো ছিলই। যার ফলে তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল, পরোপকারী, নিরহংকারী সজ্জন এক যুবক। শেখ কামালের শিষ্টাচার সম্পর্কে জানতে বেগম সুফিয়া কামাল এবং শিক্ষাবিদ আবুল ফজলের দুটি নিবন্ধ প্রণিধানযোগ্য। নিবন্ধ দুটি পড়লে তাঁর সহজাত শিষ্টাচার সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্ম যে শিক্ষা লাভ করবে, তা পরম্পরায় দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আগেই উল্লেখ করেছি, মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে শেখ কামাল সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছিলেন রাজনীতি-সমাজ-সংগীত-নাট্যের কর্মযজ্ঞে। সেই সময়ে সতীর্থ-স্বজনরা এটিকে নিছক বিনোদন ভেবে ভুল করেছিলাম। এসব কর্মযজ্ঞের ভেতর গূঢ় এক দর্শন ছিল। ছিল ইতিবাচক উদ্দেশ্য এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। শেখ কামালের লক্ষ্য ছিল আধুনিক এক সমাজ গড়ার। বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা'র অন্তর্নিহিত সঠিক রূপটি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। বুঝেছিলেন জাতির মনোজগত গঠনের দায়িত্ব বাদ দিয়ে সুস্থ সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চা হয় না। আর সুস্থ চর্চা আর সুপরিকল্পনা বাদ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়াও সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু যেমন বাংলার মূল শিকড় উপড়ে ফেলে 'সোনার বাংলা' গড়তে চাননি, তেমনি শেখ কামালও চেয়েছিলেন বাংলার পবিত্র মাটির উপর দাঁড়িয়েই বিশ্বের আধুনিক দেশ ও সমাজের সমকক্ষ হতে। এটাই তো পরম্পরার প্রকৃত শিক্ষণ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তা-চেতনা, কর্মোদ্যোগ এবং সব অর্জনেও বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলার' অন্তর্নিহিত রূপের উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটারই বহিঃপ্রকাশ ও প্রতিফলন। বড়ো বোন এবং ছোটো ভাইয়ের ভাবনায় কী অদ্ভুত ঐকতান। জীবনদর্শন, দেশপ্রেম, মানুষ ও প্রাণিকুলের প্রতি ভালোবাসা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিপ্রীতি– সব মিলিয়ে বঙ্গবন্ধুর পুরো পরিবারটিই ছিল এক সুর ও এক তালে বাঁধা। সব হারিয়েও শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা মূল সুরটি আজও অটুট রেখেছেন, বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। শতকষ্ট সয়েও ধরে রেখেছেন ৩২ নম্বরের পারিবারিক ঐতিহ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজি ডিপার্টমেন্টে, খেলার মাঠে, নাট্যমঞ্চে জাতির পিতার পুত্র হিসেবে শেখ কামাল কখনো বাড়তি কিছু প্রত্যাশা করেছেন বলে শোনা যায় না। শিক্ষকদের সঙ্গে ছিল গুরু-শিষ্যের পবিত্র সম্পর্ক। নিয়মিত ক্লাস করা, পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া, ফল যা-ই হোক, তা মেনে নেওয়া– অন্যসব ছাত্রের মতোই ছিল স্বাভাবিক আচরণ। কোথাও, কখনো কোনো ব্যাপারেই বাড়তি কিছু পাওয়ার জন্য প্রভাব খাটিয়েছেন– এমন কথা সহপাঠীদের মুখ থেকে শুনেছেন বলে শুনিনি। তবু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, জীবিতাবস্থায়ই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে অনেক মিথ্যা অপবাদ। মৃত্যুর পর বছরে বছরে তা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েছে। যে যুবক সারাক্ষণ নিমগ্ন থাকতেন শুভ কর্মযজ্ঞে, যে যুবকের মুখ কখনো বিষাদের ছায়ায় মলিন হয়নি, যে যুবককে দেখলেই উদ্দীপ্ত যৌবনের দূত বলে বিশ্বাস করতে দ্বিধা হতো না, যে যুবক কি না জীবনে সিগারেটের নেশা পর্যন্ত করেনি– সেই শেখ কামালের চারিত্রিক দোষ ধরার পরিকল্পিত চেষ্টা করা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও এটা সত্য। কিন্তু এই দুঃখজনক সত্যের পেছনে লুকিয়ে আছে গভীর-গভীরতম দুরভিসন্ধি এবং সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন এবং সত্য আবিষ্কারের দায়িত্ব ও কাজ রাজনীতি বিশ্লেষকদের, ইতিহাস চর্চাকারীদের, গবেষকদের। সেই সব সত্য নিয়ে অমর কাব্য লিখবেন তারা। আমি, অতি সামান্যজন দু-একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলার চেষ্টা করি। সব দায় গবেষকদের ওপর ছেড়ে দিয়ে আমরা তো বসে থাকতে পারি না। আমরা যদি কেবল নিজ পরিচয় ও অস্তিত্ব বড়ো করে জাহির করি, তাহলে ভীষণ ভুল হবে নাকি! ৪৫ বছর পর শেখ কামালের জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে অতিমাত্রায় উচ্ছ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতায় ঔজ্জ্বল্যে নিজেদের গৌরবান্বিত করতে শহিদ শেখ কামালের স্বতঃস্ফূর্ত ঔজ্জ্বল্য যেন ম্লান না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে উদ্দেশ করে অপপ্রচার চালিয়েছে পাকিস্তানপন্থি দলগুলো। তাদের অপপ্রচারে রাজনৈতিক শিষ্টাচার বা সংস্কৃতি অনেক সময়েই মানা হতো না। জুলফিকার আলী ভুট্টো শিষ্টাচারবহির্ভূত অশোভন ও মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বংশপরিচয় সম্পর্কে। এটা ১৯৬৯-৭০ সালের কথা। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিতও হয়েছিল (তথ্যসূত্র: আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী)। তথাকথিত শিক্ষিত স্মার্ট ভুট্টোর পক্ষেই এ ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণ সম্ভব। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ভুট্টোর আরও অনেক তথ্যের প্রসঙ্গও দেওয়া যেতে পারে। যেমন ভুট্টো বলেছিল শেখ মুজিব বলেছেন, 'ঢাকায় পাকিস্তানের রাজধানী স্থানান্তরিত হলে তিনি ছয় দফা ছেড়ে দেবেন'– এমন আরও উদাহরণ দেওয়া যাবে। ভুট্টোর মতোই এই দেশের পাকিস্তানপন্থি ফকা চৌধুরী, সবুর খান, অলি আহাদ, ওয়াহিদুজ্জামান ঠান্ডা মিয়া, মৌলবি ফরিদ আহমেদ গংরাও কি কোনো অংশে কম ছিল? বিশেষ করে সত্তরের নির্বাচনের আগে যেসব শব্দ প্রয়োগে তারা নির্বাচনি প্রচারণা করেছে, তা মোটেও শোভন ছিল না।

এছাড়া বামপন্থি (প্রধানত চীনপন্থি) বুদ্ধিজীবী যারা নিজেদের শিক্ষিত, মার্জিত হিসেবে দাবি করত, তারাই বা কম যায় কীসে! এদের ভেতর অন্যতম ছিল বদরুদ্দীন উমর, এনায়েতুল্লাহ খান প্রমুখ। শেখ মুজিব বা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে এদের প্রচারণা ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এবং সেসবের একটা দীর্ঘস্থায়ী ছায়াও বিদ্যমান। যেমন– ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবের কোনো ভূমিকা নেই, ছয় দফার সঙ্গে সিআইএ সম্পৃক্ত, আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের গোপন বৈঠক ইত্যাদি। পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় দৈনিক ডন, পাকিস্তান টাইমস, জং এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকা ছিল শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগবিরোধী অপপ্রচারের অন্যতম ঘাঁটি। কিন্তু 'অসত্যের কাছে নাহি নত হবে শির, ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর।' বঙ্গবন্ধু যথার্থ বীর ছিলেন, তাই অসত্য ও অপপ্রচারের কাছে কখনই নতশির হননি। বাঙালির স্বার্থরক্ষা তথা বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে তিনি নির্ভীক ও অবিচল ছিলেন। সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরও পশ্চিম পাকিস্তানের ডন এবং জং নামক বহুল প্রচারিত দৈনিক লিখেছিল 'শেখ মুজিব ইসলামাবাদে শপথ নিতে যাচ্ছেন'। তথ্যটি ছিল ডাহা মিথ্যা। সবচেয়ে ভয়াবহ খবর ছাপা হয়েছিল '৭১-এর ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পর। জং, পাকিস্তান টাইমস এবং অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল 'মুজিব ভারতে পালিয়ে গিয়েছে'। খবরটি ভয়াবহ এই জন্য যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার না দেখিয়ে রাতের আঁধারে হত্যাও করতে পারত।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও প্রতিপক্ষরা কি চুপচাপ বসেছিল! পাকিস্তানের বন্দিশালায় অন্তরিন থাকা অবস্থায় সেখানকার পত্রিকায় ছাপা হলো যে, শেখ মুজিব পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন চায়। এই খবর নিয়ে রাজনীতি শুরু করল খন্দকার মোশতাক, মশিউর রহমান যাদু মিয়া, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, শাহ আলীম, মাহবুব আলম চাষী গং। এটিকে স্বাভাবিক রাজনীতি না বলে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলাই ভালো।

সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছিল। কিন্তু তথ্যমতে, ত্রিশ ভাগের কাছাকাছি ভোটার আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি অথবা ভোটদানে বিরত থেকেছে। সংখ্যার হিসাবে যা দুই কোটিরও বেশি। যদি ধরে নিই এরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না তবে কি ভুল হবে? ধরা যাক, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি শাসকের পক্ষেই তারা অবস্থান নিয়েছিল। আওয়ামী লীগের নৌকায় যারা ভোট দিয়েছিল, তাদের ভেতর সবাই কি বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতার পক্ষে ছিল? সম্ভবত নয়। যদি সত্য হতো, তাহলে অনেক নির্বাচিত সংসদ সদস্য, তাদের ছেলেমেয়ে, আত্মীয় আপস করে দেশেই থেকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতেন না। আমি এ ব্যাপারে ঢালাও মন্তব্য করছি না। কারণ স্বাধীনতাপ্রত্যাশী অনেকেই দেশের অভ্যন্তরে থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অল্পবিস্তর কাজ করেছেন, অহর্নিশ মুক্তির প্রার্থনা করেছেন বঙ্গবন্ধুর জন্য, দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের বহু বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানি শাসকদের সমর্থন দিয়েছিলেন আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে। তাদের সবাই যে চাপে পড়ে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তা বোধহয় নয়। স্বাধীনতার পর এদের ভেতর কেউ কেউ গ্রেফতার হয়েছিলেন। আরেকটি দল সশস্ত্র বিপ্লবের পথে নকশালবাড়ি স্টাইলে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। কোথাও কোথাও তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। এরা ছিল চীনপন্থি। এদের প্রধান নেতাদের অনেকেই স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে নেতা হিসেবে মানার তো প্রশ্নই আসে না। স্বাধীনতার পর এসব গোপন সংগঠন এবং নেতা প্রায় শুরু থেকেই বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যারপরনাই তৎপর হয়ে ওঠে। গ্রামে গ্রামে ডাকাতি, লুটপাট, হত্যা– এসব সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করতে থাকে তারা। এদের সঙ্গে যুক্ত হয় অস্ত্রধারী রাজাকার, আলবদরের সদস্যরা। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের বিরুদ্ধে তারা বাধা সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শারদীয় দুর্গোৎসবের আয়োজনে। বেশকিছু গ্রামাঞ্চলে তারা প্রতিমা ও মণ্ডপ ভাঙচুর করে। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট এবং একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টিতে এটা ছিল এক নষ্ট রাজনৈতিক খেলা।

ঠিক কাছাকাছি সময়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধ্বজা তুলে গঠিত হলো জাসদ এবং জাসদ ছাত্রলীগ। নেতৃত্বে প্রায় সবাই সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সদস্য এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। এদের নেতৃত্বে গঠিত হলো গণবাহিনীর মতো একটি অস্ত্রধারী দল এবং গণকণ্ঠের মতো বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগবিরোধী দৈনিক পত্রিকা। সাপ্তাহিক হলিডে এবং সাপ্তাহিক হক কথার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গণকণ্ঠ বাড়াল অপপ্রচারের শক্তি। এর মধ্যে পাকিস্তান থেকে ফিরতে শুরু করলেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। তাদের দাবিদাওয়া এবং মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকদের সঙ্গে দূরত্ব ও মনোমালিন্য দিনে দিনে বাড়তেই থাকল। সবকিছু মিলিয়ে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুর সরকারকে চাপে ফেলার চেষ্টা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অসামান্য শক্তি, নির্ভীক নেতৃত্ব ও সফলতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি শনৈ শনৈ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হওয়া পছন্দ হয়নি অনেকের। তাদের ঠুনকো অহংকারে আঘাত লেগেছিল। কারণ তারা ছিল 'উচ্চঘর, বংশরাজের বংশধর'। আর বঙ্গবন্ধু ছিলেন টুঙ্গিপাড়ার ভূমিপুত্র। গণমানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা। সাধারণের সঙ্গে অসাধারণ এক মহাপুরুষ, যার উচ্চতার পাশে 'বংশরাজের বংশধর'রা বামনসদৃশ। ঈর্ষাটা ছিল শ্রেণিচরিত্রের বিভাজনে। সামরিক-বেসামরিক এলিটদের চা-কফি-হুইস্কির আড্ডায় তাই প্রধান বিষয় ছিল বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ফিসফিসানি। যাকে পরিশীলিত ভাষায়, গাল ভরা বাক্যে বলা হয় হুইসপারিং অপপ্রচার। রাজনীতির পথচলায় বঙ্গবন্ধু সব সময় নিঃসঙ্গ শেরপা। আগরতলা মামলার মতো একটি ভয়ংকর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে যখন গ্রেফতার করা হয়, তখন কিন্তু কোনো রাজনৈতিক নেতা তাঁর পাশে আসেননি, একটা বিবৃতি পর্যন্ত দেননি। রাষ্ট্রপরিচালনার সময়ও তিনি যখন বিধ্বস্ত একটি নবীন দেশকে পুনর্গঠনে রাতদিন হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখনও তাঁর পাশে না এসে প্রায় সবাই ছিল সমালোচনামুখর। রাজনীতির মারপ্যাঁচে এবং রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি খুঁজে না পেয়ে প্রতিপক্ষের কৌশলী অস্ত্র হলো বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে সামাজিকভাবে হেয় করা। চা-কফির কাপে এবং হুইস্কির গ্লাসে ঝড় তুলে তৈরি হতো এ ব্যাপারে নোংরা রণকৌশল। আর ফর্মুলা মতো কাজ করত বিপক্ষের রাজনৈতিক অপশক্তির দল। কখনো একা, কখনো দল বেঁধে। যেহেতু বঙ্গবন্ধুর বড়ো পুত্র শেখ কামাল ছিলেন সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে কর্মচঞ্চল এবং তরুণ সমাজের নেতৃত্বে জনপ্রিয়তম, সেহেতু তাঁকেই প্রধান টার্গেট করেছিল বিপক্ষ শক্তি। শেখ কামালের চরিত্রহননের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল এমন সব কল্পকাহিনি, যা সাধারণজনের কাছে অত্যন্ত ঘৃণার বিষয়। আর অপবাদের তুঁতের আগুনে বাতাস দিয়েছে কিছু সংবাদমাধ্যম, যাদের নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ ও স্বাভাবিক বিশ্লেষণে অনেকেই অপপ্রচারের বিষয়গুলোর সত্যতা যাচাই করেনি। প্রতিবাদ তো দূরের কথা। এ ব্যাপারে শেখ কামালও ছিলেন পিতা বঙ্গবন্ধুর মতো নিঃসঙ্গ শেরপা।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর শাসকশ্রেণি বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে শেখ কামাল সম্পর্কে মিথ্যা ও নোংরা অপবাদ ... মূলত ধ্বংস করতে চেয়েছে বঙ্গবন্ধুর মতো মহানায়কের বিশাল ভাবমূর্তি, তাঁর পরিবারের সহজিয়া জীবনদর্শন এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য ও ইতিহাস

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর শাসকশ্রেণি বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে শেখ কামাল সম্পর্কে মিথ্যা ও নোংরা অপবাদ এবং অপপ্রচারকে আরও পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করেছে। শেখ কামালের চরিত্রহননের মাধ্যমে তারা মূলত ধ্বংস করতে চেয়েছে বঙ্গবন্ধুর মতো মহানায়কের বিশাল ভাবমূর্তি, তাঁর পরিবারের সহজিয়া জীবনদর্শন এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য ও ইতিহাস।

কিন্তু দিনে দিনে সত্য প্রকাশিত হচ্ছে নিজ শক্তিতে। বহুমাত্রিক শেখ কামালকে চিনতে আগ্রহী হচ্ছে নতুন প্রজন্ম। এটাই আশার কথা। এটাই শেখ কামালের শুভ কর্মের ফল।

**লেখক: আহ্বায়ক, সম্প্রীতি বাংলাদেশ**

# বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ও তাঁর ছায়াতলে জীবন

বাহালুল মজনুন চুন্নু

মানুষ স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে। কিছু কিছু স্মৃতি হয়ে উঠে মানুষের জীবনে চলার পাথেয়। আমার জীবনেও আছে এমন কিছু ঘটনা, এমন কিছু অভিজ্ঞতা, যা আমাকে সব সময় শক্তি দেয়, সাহস জোগায়। জীবনের ঘূর্ণিপাকে যখন দিশেহারা হয়ে পড়ি, তখন মনের মধ্যে চট করে হাজির হয়ে যায় সেসব স্মৃতি, যা আলোকবর্তিকা হয়ে আমাকে পথ দেখায় সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার। ওইসব স্মৃতির বেশির ভাগই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন কর্মী হওয়ায় সেই মহামানবের, সেই মহান বীরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল আমার। সেই অকুতোভয় দেশপ্রেমিক যোদ্ধাকে, তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে খুব কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করেছি, বোঝার ও শেখার চেষ্টা করেছি। তাঁর সান্নিধ্য যতবার পেয়েছি, ততবারই নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি, নিজের মাঝে নতুন এক শক্তিকে জেগে উঠতে দেখেছি। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক জ্যোতির্ময় নক্ষত্র, যার আলোকচ্ছটায় চারপাশ আলোকিত হয়ে যেত। এমন জ্যোতির্ময়ের উপস্থিতি আমার মতো লাখো তরুণকে উদ্দীপ্ত করেছে, দীর্ঘ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেষিত করেছে।

ষাটের দশকে আমার মতো শিশু ও কিশোরদের কাছে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এমন একজন মহানায়ক, যাকে না দেখেও তাঁর ডাকে সাড়া দিতে একবিন্দু দ্বিধা কাজ করত না কারও মনে। তিনি ছিলেন এমনই এক উন্মাদনার নাম। ১৯৬৬ সাল। তখন আমি ফরিদপুর ঈশান ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণির ছাত্র। রাজনীতি তেমন একটা বুঝতাম না। শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দিয়েছেন। এর

মর্মার্থ ভালোভাবে না বুঝলেও এটুকু বুঝেছি– বাঙালির জন্য অবশ্যই ভালো কিছুই তিনি দিয়েছেন। কলেজের বড়ো ভাইয়েরা স্কুলে এসে আমাদেরকে তাদের সঙ্গে ছয় দফা দাবি আদায়ে মিছিলে যেতে বলেন। আমরাও বেশ কয়েকজন বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে যোগ দিই। কিন্তু বিধিবাম। পুলিশ আমাদের ওপর লাঠিচার্জ শুরু করে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বই-খাতা নিয়ে দৌড়ে পাশের একটি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে রক্ষা করলাম। ওই সময়ই উপলব্ধি করলাম পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের বাঙালিদের ওপর নানা-ভাবে অত্যাচার-নিপীড়ন চালাচ্ছে এবং শেখ মুজিবুর রহমান সেসবের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলছেন। আর সেই লড়াই যেন তিনি না চালিয়ে যেতে পারেন, সেজন্যই পুলিশের এই লাঠিচার্জ। ওই ঘটনাটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

১৯৬৮ সালের শুরুর দিকে আমি যখন সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র, তখন চার আনা অর্থাৎ পঁচিশ পয়সা দিয়ে ছাত্রলীগের সাধারণ সদস্য হই। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সামরিক শাসকের অত্যাচার, জেল-জুলুম, নির্যাতন– বাঙালির জীবন তখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধু একটার পর একটা আন্দোলনের কর্মসূচি দিচ্ছেন। সেসময়ে ছাত্রলীগের সাধারণ সদস্য হওয়ার পর আমার চেয়ে বয়সে বড়ো এমন অনেক ছাত্র-জনতা আমাকে সম্মান করত। তখন আমি মানসিকভাবে অহংবোধ করতাম। শিক্ষা-শান্তি-প্রগতির পতাকাতলে হাজির হতে পেরে নিজের মধ্যে অন্য একরকম উন্মাদনা অনুভব করতাম। যে বয়সে যুবক, ছাত্ররা ঘুরে বেড়াত, আনন্দ করত, রোমান্স করত; সে বয়সে আমরা ছাত্রলীগের কর্মী হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো পথে বাঙালির কল্যাণের জন্য কাজ করাকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করতাম। বাবা-মা রাজনীতি না করার জন্য বলতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অমিয় ডাকে সাড়া দিয়ে রাজনীতির পথ থেকে সরে আসিনি। বঙ্গবন্ধু কী ঘোষণা দিয়েছেন, আন্দোলনের কী নির্দেশ দিয়েছেন, তা জানার জন্য যেমন উদ্‌গ্রীব থাকতাম, তেমনি তা অক্ষরে অক্ষরে পালনও করতাম। ১৭ জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করল। এই মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে ছাত্র-জনতা। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছয় দফা সংবলিত ১১ দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আমরা ফরিদপুরের ছাত্রসমাজ সেই আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এদেশকে গড়ার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু করলাম। আন্দোলনের তীব্রতা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, সব দাবি এক দফায় পরিণত হলো, যা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি। কেননা ছাত্র-জনতা বুঝেছিল– তাঁর মুক্তিই পারে বাঙালিকে দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনার শেকল থেকে মুক্তি দিতে। গণ-আন্দোলন ক্রমান্বয়ে গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হলো। পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সবাইকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। সেই উত্তাল দিনগুলোয় প্রতিদিন ছাত্র-জনতার মিছিল আর সন্ধ্যায় মশাল হতো, যার আয়োজনে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতাম একজন কর্মী হিসেবে। কখনো মশাল বানাতাম, কখনো সভার মঞ্চ তৈরি করতাম। কখনো পোস্টার লিখতাম, কখনো দেওয়ালে চিকা মারতাম– যাকে আজ দেওয়াললিখন বলা হয়। এ কাজগুলো করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। সেসময় পারিশ্রমিক দিয়ে লেবার এনে কাজ করানোর কোনো নিয়ম বা রীতিনীতি ছিল না। নিজেরাই সব কাজ করতাম। দুঃখের বিষয়, আজ আর এসব দেখা যায় না।

> ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল। ... অনেক সুসজ্জিত গেট করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষ্যে পুরো ক্যাম্পাসকে ঝকঝকে-তকতকে করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল এক মাস ধরেই

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার সরাসরি প্রথম দেখা হয় ১৯৬৯ সালে। আগরতলা মামলা থেকে বেরিয়ে ফরিদপুর হয়ে গোপালগঞ্জে যাওয়ার পথে ফরিদপুর বিরতি দিয়েছিলেন। তিনি ফরিদপুরের ঝিলটুলী সিএন্ডবির ডাকবাংলোয় উঠেছিলেন। জেলা ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে সর্বকনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে সেই সময় আমারও তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল। ফরিদপুর স্টেশন রোডে ছাত্রলীগ অফিস উদ্বোধনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে আমরা অনুরোধ করলাম। বঙ্গবন্ধু রাজি হলেন। পরদিন সকাল ১০টায় তিনি অফিস উদ্বোধন করবেন। আমরা দুটি মাইকের হর্ন রিকশায় বেঁধে সারা শহর ঘুরে বঙ্গবন্ধুর সমাবেশের কথা প্রচার করলাম। লোকে লোকারণ্য জনতার ঢেউ নামল স্টেশন রোডে।

ওই মহামানব আসে,/
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে/
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে ॥
/সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,/
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক–/
এলো মহাজন্মের লগ্ন।/ আজি
অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত/ ধূলিতলে
হয়ে গেল ভগ্ন।/উদয় শিখরে জাগে
'মাভৈঃ মাভৈঃ'/ নবজীবনের আশ্বাসে।/
'জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয়'/ মন্দ্রি-উঠিল
মহাকাশে ॥ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানের

মতোই ফরিদপুরবাসী বঙ্গবন্ধুর আগমনে নবজীবনের আশ্বাস পেয়েছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধু খুবই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। কিন্তু বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তাচেতনা, আগামী দিনের সব নির্দেশনা ফুটে উঠল। তিনি কবি জসীমউদ্‌দীনের কবিতার চার লাইন কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন। আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা/ আমি বাঁধি তার ঘর/ আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই/ যে মোরে করেছে পর। এরপর বঙ্গবন্ধু 'জয় বাংলা' বললেন। সেই সময়ই বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা বলতেন। এই জয় বাংলা বলাটার মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ হয়ে যায়। এর প্রমাণ আমরা পাই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে। সেদিন তিনি সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। কেন তিনি সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, তা তিনি পরে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি যদি বলতেন, আজ আমি স্বাধীন বাংলাদেশ

রাষ্ট্রের ঘোষণা করছি, তো কী ঘটত?' বঙ্গবন্ধু জবাবে বলেন, 'বিশেষ করে ওই দিনটিতে আমি এটা করতে চাইনি। কেননা বিশ্বকে তাদের আমি এটা বলার সুযোগ দিতে চাইনি যে, মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং আঘাত হানা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প ছিল না। আমি চাইছিলাম তারাই আগে আঘাত হানুক এবং জনগণ তা প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল।' বাংলার জনগণ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু সেজন্য সবদিক থেকে প্রস্তুতি তখনও সম্পন্ন হয়ে উঠেনি। তাই সেদিন তিনি স্বাধীনতার সরাসরি ঘোষণা করেননি। বরং বাঙালিকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। বাঙালিকে সংগ্রামের জন্য উদ্দীপ্ত করেছিলেন। তাই তো বঙ্গবন্ধুর ডাকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এদেশের মানুষ, ছাত্র-জনতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই তো পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন লিখেছেন, 'মুজিবুর রহমান!/ ওই নাম যেন ভিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান।/ বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে,/ জ্বালায় জ্বলিছে মহা-কালানল ঝঞ্ঝা-অশনি বেয়ে।/ বিগত দিনের যত অন্যায় অবিচার ভরা-মার,/ হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে সহ্যের অঙ্গার;/ দিনে দিনে হয়ে বর্ধিত স্ফীত শত মজলুম বুকে,/ দগ্ধিত হয়ে শত লেলিহান ছিল প্রকাশের মুখে;/ তাই যেন বা প্রমূর্ত হয়ে জ্বলন্ত শিখা ধরি/ ওই নামে আজ অশনি দাপটে ফিরিছে ধরণী ভরি।' আমরা তরুণরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। ভারতে ২৪ দিনের ট্রেনিং নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম রণক্ষেত্রে। আমার মতো লাখো তরুণ বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে জীবনবাজি রেখে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। বঙ্গবন্ধু নামটি সেই সময় আমাদের ছিল সাহসের উৎস। এজন্যই কবি শামসুর রাহমান বলেছেন, 'ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো/ দুলতে থাকে স্বাধীনতা/ ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর ঝরে/ মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।'

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে বেরিয়ে লন্ডন-দিল্লি হয়ে স্বদেশ ফেরার পর প্রথম যখন ফরিদপুর হয়ে গোপালগঞ্জ আসেন, তখন ফরিদপুর সার্কিট হাউসের সামনে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁকে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়ার সময় তাঁর পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। সে এক অদ্ভুত ভালো লাগার অনুভূতি, যা বলে বা লিখে বোঝানো যাবে না। এরপর তাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি থাকা অবস্থায় ছাত্রলীগের বর্ধিত সভা শেষে তৎকালীন সভাপতি শেখ শহিদুল ইসলাম এবং এমএ রশিদের নেতৃত্বে রমনা পার্কের বিপরীতে পুরোনো গণভবনে ১৯৭২ সালে। আমরা অনেক সমস্যার কথা বলেছিলাম সেদিন। তিনি সেদিন তাঁর বক্তব্যে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন। ওই সময়টায় দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে স্বাধীনতাবিরোধীদের অপতৎপরতা আর অন্যদিকে জাসদসহ পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির নৈরাজ্য সদ্যস্বাধীন দেশের সার্বিক পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলেছিল। বঙ্গবন্ধু পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই এবং সেখানে সক্রিয়ভাবে ছাত্রলীগের রাজনীতি করতে থাকি। আমরা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাঁর নির্দেশ মোতাবেক যার যার অবস্থান থেকে দেশ গড়ার কাজে হাত লাগিয়েছিলাম।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তৎকালীন পূর্ব জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত দশম বিশ্ব যুব উৎসবে ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে যোগদান করার সুযোগ হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা ও সংহতির এই সম্মেলনে লিডার অব ডেলিগেশন ছিলেন কামাল ভাই। তাঁর নেতৃত্বে আমরা ১৫ জন সেই যুব উৎসবে যোগ দিই। যাওয়ার আগে আমরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে দেশের ঐতিহ্য ধরে রাখার এবং কোনো খারাপ পথে যেন না যাই, সেরকম পিতৃসুলভ নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ২৫ আগস্ট হিটলারের বাসভবন চ্যান্সেলর ভবনের (বর্তমানে মিউজিয়াম) সামনে থেকে মার্চপাস্ট করে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে আমরা বার্লিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে পৌঁছাই। সেখানে যখন পৌঁছাই, তখন সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে আমাদের দীর্ঘ নিপীড়ন-শোষণের কথা বলা হলো। বলা হলো আমাদের জনতার সংগ্রামের কথা। তখনও অনেকেই বাংলাদেশের নামটি জানত না। ধারাভাষ্যে যখন আমাদের জাতির পিতার দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা জানানো হলো, তখন স্টেডিয়ামের সব মানুষ দাঁড়িয়ে জাতির পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিল। ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকের (ইউএসএসআর) প্রতিনিধিরা তাদের নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিনের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের তুলনা করে স্লোগান দিয়েছিল– লেনিন লেনিন, মুজিব মুজিব। ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা হো চি মিনের সঙ্গে মুজিব মুজিব বলে স্লোগান দিয়েছিল। সেই দিন বঙ্গবন্ধুকে তারা যে সম্মান দেখিয়েছে, সেই দৃশ্য আমাদেরকে শিহরিত করেছে। বিশ্ববাসী যে বঙ্গবন্ধুকে চেনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে চিনছে, সেটা তখন আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম। শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ-তিতিক্ষা বিশ্ববাসীর কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সেটাও আমরা বুঝতে পারলাম। বঙ্গবন্ধু শোষিত মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি এতটাই প্রতিকূল ছিল যে, বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণার দিন মঞ্চের সামনে কর্মী হিসেবে থাকার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যে সেদিন আমাকে ভীষণ নাড়া দিয়েছিল। আমি বুঝেছিলাম বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা কেবল একদিনের চিন্তার ফসল নয়। বাঙালির কল্যাণের জন্য দীর্ঘকালীন চিন্তাই এই ঘোষণার উৎস। ১৯৭৫ সালের প্রথমদিকে গণভবনে ছাত্রলীগের জাতীয় কার্যকরী সংসদের সদস্য হিসেবে আমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর। সেদিন দেশের সার্বিক পরিস্থিতি আলোচনা করে তিনি আমাদের করণীয় কী হবে, তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমরাও তাঁর ধ্যানধারণাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে দেশের জন্য আমাদের পরবর্তী করণীয় কী হবে, তা বুঝতে পেরেছিলাম।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল। জাতির পিতা আমাদের মাঝে আসবেন, এই খুশিতে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে রঙিন করে তুলেছিলাম। অনেক সুসজ্জিত গেট করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষ্যে পুরো ক্যাম্পাসকে ঝকঝকে-তকতকে করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল এক মাস ধরেই। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন অন্যায়ের প্রতিবাদের কারণে তাঁর ছাত্রত্ব চলে গিয়েছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আসবেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে। তাঁকে সাদরে বরণ করে নিতে আমরাও ফুলের ডালি সাজিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের হৃদয়ের সব ভালোবাসা উজাড় করে তাঁকে পুষ্পমাল্যে বরণ করে নেব, এই প্রত্যাশায় আমরা ছিলাম উজ্জীবিত প্রাণ। সেই রাতে আমরা কলা ভবনের পূর্বদিকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং সব ডেকোরেশনের তদারকি করছিলাম। ক্লান্তিহীনভাবে আমরা কয়েকজন বন্ধু কাজ করে গিয়েছিলাম। আমাদের আদর্শের মহানায়ক আসবেন, তাই ক্লান্তি আমাদের কাছে ঘেঁষতে পারেনি। সব কাজকর্ম সেরে আমরা কয়েকজন বন্ধু মুহসীন হলের গেস্টরুমে বসে নানা বিষয়

নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে করতে সেই রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দিয়েছিলাম। ভোর পৌনে ৫টার দিকে আমাদের বন্ধু আবু বকর সিদ্দিক দৌড়ে এসে গোলাগুলির আওয়াজ হওয়ার কথা বলে। আমরাও শুনতে পেলাম। দৌড়ে হলের ছাদে উঠে যাই। ধানমন্ডির আর মিন্টো রোডের দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাই। অজান্তেই শরীর হিম হয়ে যায়। চিত্তমাঝে অজানা আশঙ্কার খেলা। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমরা বেরিয়ে পড়ি, কী হয়েছে তা না জানা পর্যন্ত পরিত্রাণ নেই। প্রথমে শাহবাগ এসে দেখি কালো পোশাক পরিহিত ট্যাঙ্ক বাহিনী সেখানে অবস্থান নিয়েছে; তখন আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় গুলি হচ্ছিল। আমরা মিন্টু রোডের দিকে যেতে চাইলে ওরা বাধা দেয়। এরপর আমরা নানা উপায়ে কলাবাগান বাসস্ট্যান্ডের কাছে যাই। সেখান থেকে আর সামনের দিকে এগোতে পারিনি। বাসস্ট্যান্ডে কিছু লোক দাঁড়িয়ে কানাঘুষা করছিল। তাদের কানাঘুষায় শুনতে পেলাম আমাদের জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে। নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যে পিতা একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে সেই রাষ্ট্রেরই কেউ হত্যা করেছে! ভাবতেই পারছিলাম না। আমাদের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু মুছতে মুছতে আমরা হলে ফিরে আসি। শোকে মোহ্যমান আমার মতো অন্যদের হৃদয়েও ধ্বনিত হচ্ছিল শামসুর রাহমানের কবিতার এই কয়েকটি লাইন–

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়?/ তেমন যোগ্য সমাধি কই?/ মৃত্তিকা বলো, পর্বত বলো/ অথবা সুনীল-সাগর-জল-/ সবকিছু ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই!/ তাইতো রাখি না এ লাশ আজ/ মাটিতে পাহাড়ে কিম্বা সাগরে,/ হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই।

জাতির পিতাকে এদেশের আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা বাঙালি নরঘাতকরা না চিনলেও চিনেছিলেন বিশ্বের সব রথী-মহারথী। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেছিলেন, আমি হিমালয় দেখিনি; কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্বে, সাহসিকতায় এই মানবই হিমালয়। আর এভাবেই আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। শ্রীলঙ্কার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষ্মণ কাদির গামা এ মহান নেতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছিলেন, দক্ষিণ এশিয়া গত কয়েক শতকে বিশ্বকে অনেক শিক্ষক, দার্শনিক, দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক নেতা ও যোদ্ধা উপহার দিয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সবকিছুকে ছাপিয়ে যান, তাঁর স্থান নির্ধারিত হয়ে আছে সর্বকালের সর্বোচ্চ আসনে। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের ভাষায়– বঙ্গবন্ধু নিজেই ছিলেন 'ঐশ্বরিক আগুন' এবং তিনি নিজেই সে আগুনে ডানা যুক্ত করতে পেরেছিলেন। ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডসের সদস্য ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শীর্ষস্থানীয় যোদ্ধা ফেনার ব্রকওয়ে বলেছেন, সংগ্রামের ইতিহাসে লেনিন, গান্ধী, নক্রুমা, লুবুম্বা, কাস্ত্রো ও আলেন্দের সঙ্গে মুজিবের নামও উচ্চারিত হবে। শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা ছিল মানব হত্যার চেয়ে অনেক বড়ো অপরাধ। শেখ মুজিব শুধু তাঁর জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করেননি, তিনি তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যও সংগ্রাম করেছিলেন।

হলে ফিরে দিগ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা বিষণ্ন মনে রেডিয়োতে শুনি খুনি ডালিম বঙ্গবন্ধু হত্যার কথা ঘোষণা করছে। শিরা-উপশিরায় ক্রোধ বয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আগেই কারফিউ জারি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে দেয় খুনিচক্র। ওই অভিশপ্ত দিনে ক্যাম্পাস এলাকায় টহল দিচ্ছিল মেশিনগান সজ্জিত ট্যাঙ্ক। হতবিহ্বল বিক্ষুব্ধ আমরা তাই কেউ কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে আন্দোলনে নামতে পারিনি সেই দিন। দিনটি ছিল শুক্রবার। জুমার নামাজের জন্য কারফিউ বিরতি দিলে আমরা হল থেকে বেরিয়ে পড়ি। এরপরই শুরু হয় আমাদের পলাতক জীবন। জেল-জুলুম আর হুলিয়ার আতঙ্কে কাটানো ভয়ংকর সে এক জীবন! তবে হৃদয়ে বইতে থাকে প্রতিশোধের আগুন। আর মনে উদয় হতে থাকে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী' কবিতার কয়েকটি লাইন– সহসা ঘুমের তল্লাট ছেড়ে/ শান্তি পালাল আজ।/ দিন ও রাত্রি হল অস্থির/ কাজ, আর শুধু কাজ! /জনসিংহের ক্ষুব্ধ নখর/ হয়েছে তীক্ষ্ণ হয়েছে প্রখর/ ওঠে তার গর্জন–/ প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

ওইদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আমরা হত্যার প্রতিবাদ করতে না পারলেও ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, খুলনা এবং বরগুনাসহ ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জায়গায় হয়েছিল প্রতিবাদী মিছিল। তবে তা তীব্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। একদিকে কারফিউ, অন্যদিকে জাতীয় চার নেতার গ্রেফতার– শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের আত্মগোপন, পদস্খলন কিংবা ভীত হয়ে কারও কারও খুনি মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদানের কারণে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেনি। সাধারণ কর্মীরা খুঁজে পায়নি কোনো শীর্ষনেতাকে। সেই সময় যদি শীর্ষ নেতাদের কেউ প্রতিবাদের উদ্যোগ নিতেন, তবে হয়তো ইতিহাস লেখা হতো ভিন্নভাবে। কঠিনতর সেই পরিস্থিতিতে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় ছাত্রলীগের আমরা কয়েকজন নেতাকর্মী প্রতিবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম করার জন্য গোপনে আলোচনা চালাতে থাকি। ১৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খোলে। এর আগের রাতেই একদল অকুতোভয় কর্মী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কলাভবন, মধুর ক্যান্টিন, কার্জন হলসহ পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পোস্টার ও দেওয়াললিখনে ভরিয়ে দেন। দেওয়াললিখনের ভাষা ছিল: 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'এক মুজিবের রক্ত থেকে লক্ষ মুজিব জন্ম নেবে'। ২০ অক্টোবর মধুর ক্যান্টিনের সামনে জাতির পিতার হত্যার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছিলাম আমরা। এরপর মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেছিলাম। মিছিলটি নিউমার্কেটের সামনে পৌঁছলে পুলিশের বাধায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমাদের এই মিছিলই ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে ঢাকার প্রথম সংঘবদ্ধ মিছিল। এ মিছিল মোশতাকের ক্ষমতার মসনদকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল আর আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগের দিশেহারা দিগ্‌ভ্রান্ত নেতাকর্মীদের মাঝে। আটাত্তরে ওবায়দুল কাদের বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আর আমি সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হলে ৩২ নম্বর বাড়িতে গিয়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর রক্ত ছুঁয়ে শপথ করেছিলাম যেভাবেই হোক তাঁর খুনের বদলা নেব। সারা বাংলাদেশ চষে বেড়িয়ে ছাত্রলীগকে সংগঠিত, শক্তিশালী করে আওয়ামী লীগের বন্ধুর যাত্রাপথকে সহজ করে তুলেছিলাম। আমরা তা পেরেছিলাম জাতির পিতার আদর্শকে বুকে ধারণ করেছিলাম বলেই। এখনো জাতির পিতার আদর্শ আমার জীবন চলার পাথেয়। এখনো প্রতিনিয়ত তাঁর কর্ম-চিন্তা-দেশপ্রেম আমাকে শক্তি জোগায়। প্রতিনিয়তই হৃদয়মাঝে অনুভব করি তাঁর উপস্থিতি। তাই সৈয়দ শামসুল হকের 'আমার পরিচয়' কবিতার মতো বলতে হয়– 'এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান?/ যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান;/ তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি–/ চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি।'

**লেখক: সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি**

# বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য

সিমিন হোসেন রিমি

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক অবিচ্ছেদ্য নাম। দেশপ্রেমের অনন্ত শক্তির উৎস তিনি। বঙ্গবন্ধুর জীবনকর্ম, চিন্তাচেতনা সবকিছু ছিল মানুষকে ঘিরে। তিনি মানুষের মুক্তির চিন্তায় যেমন উদ্‌গ্রীব ছিলেন, তেমনি সমাধানের পথও খুঁজেছেন বাস্তবতার নিরিখে।

বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব সর্বোপরি বাংলাদেশের প্রতীক। বিশ্বমানচিত্রে যে বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশের প্রতীক তিনি।

জাতীয় শোক দিবসে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি এই বাংলার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সবাইকে।

যাকে হারানোর বেদনা অমোচনীয়, তিনি কালে কালে হয়ে উঠেন সব প্রেরণার উৎস। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বঙ্গবন্ধুকে তিলে তিলে জয় করতে হয়েছিল দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। সহ্য করতে হয়েছিল নিদারুণ নিপীড়ন। তারপরও সবকিছু সহ্য করে নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় তিনি খুঁজেছেন মানুষের সার্বিক মুক্তির পথ। তাঁর চিন্তাকে ঘিরে ছিল মানুষ আর মানুষের কষ্ট মোচনের ভাবনা।

চিন্তাচেতনা, সাহসে-কর্মে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনন্য। দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য কী কী চাই, এর সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তিনি তাঁর সত্তরের নির্বাচনের প্রাক্কালে দলীয় কর্মসূচি হিসেবে ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর বেতার ও টেলিভিশনে সুদীর্ঘ লিখিত বক্তব্যে তুলে ধরেন। আজ তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সেই বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ তুলে ধরা হলো: 'পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে, তারা জনগণের

পাশেই থাকবে, স্বৈরাচারী ও শোষকগোষ্ঠীর মোকাবিলার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে। কোনো জাতি কোনো দিনই আত্মাহুতি না দিয়ে মুক্তি ও ন্যায়বিচার পায়নি। তাই আজ আওয়ামী লীগ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোকে জানিয়ে দিতে চাই যে, পাকিস্তানের জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের মোকাবিলা আওয়ামী লীগ অবশ্যই করবে। গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা বিঘ্নিত করা হলে আওয়ামী লীগ সবশক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম আর সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকাশ। ... প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষিব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। ... কৃষিব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। ... অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বনজসম্পদ, ফলের চাষ, গোসম্পদ এবং নৌ-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। ... বিপুলভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যাপকভাবে বিজলি সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। ... অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই। ... সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না। ... জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সব শ্রেণির জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। ... চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসা সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লি চিকিৎসাকেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপনের দরকার। চিকিৎসা গ্র্যাজুয়েটদের জন্য 'ন্যাশনাল সার্ভিস' প্রবর্তনের প্রয়োজন। পল্লি এলাকার জন্য বিপুলসংখ্যক প্যারা মেডিকেল পার্সনদের ট্রেনিং দেওয়া দরকার। ... অর্থনীতির সর্বত্র মজুরি কাঠামো ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ... পরিশেষে বলতে চাই, জাতি হিসেবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে– আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করবই। ... আওয়ামী লীগ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাআল্লাহ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হব।' (তথ্যসূত্র: দৈনিক আজাদ, ২৯ অক্টোবর ১৯৭০)।

> বঙ্গবন্ধুকে তিলে তিলে জয় করতে হয়েছিল দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। সহ্য করতে হয়েছিল নিদারুণ নিপীড়ন। তারপরও সবকিছু সহ্য করে নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় তিনি খুঁজেছেন মানুষের সার্বিক মুক্তির পথ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত উদার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলার সব মানুষকে সেই স্বপ্নের ডাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। যার ফলে জন্মলাভ করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর অনন্য নেতৃত্বের স্পর্শে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ নতুন করে জেগে উঠতে থাকে। এর একটি সুন্দর বিবরণ আমরা পাই ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ভাষণে। সেই ভাষণের অংশবিশেষ তুলে ধরছি– '১৯৭১ সালের এই ডিসেম্বর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি। একই দিনে আমাদের দেশ গড়ার সংগ্রাম শুরু। স্বাধীনতাসংগ্রামের চাইতেও দেশ গড়ার সংগ্রাম বেশি কঠিন। দেশগড়ার সংগ্রামে আরও ত্যাগ, আরও বেশি ধৈর্য, আরও বেশি পরিশ্রম দরকার। ... এর আগে কী নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম? চারদিকে অসংখ্য নরকঙ্কাল, বুদ্ধিজীবীর লাশ, বীরাঙ্গনা মা ও বোনের হাহাকার, অচল কলকারখানা, থানা, আইন-আদালত পর্যন্ত বিধ্বস্ত, ব্যাংকে তালা, ট্রেজারি খালি, রেলের চাকা বন্ধ, রাস্তা-ব্রিজ ধ্বংস, বিমান ও জাহাজ একখানাও নাই। যুদ্ধের জন্য অনেক ক্ষেতে ফসল বোনা সম্ভব হয়নি। পাট ঘরে উঠেনি। নৌকা-স্টিমার, লঞ্চ, বাস, লরি, ট্রাকের শতকরা ৭০ ভাগ হয় নষ্ট, না হয় অচল। অনেকের হাতে তখন অস্ত্র। তাদের মধ্যে আছে বহু দুষ্কৃতকারী। আমাদের প্রয়োজনীয় সৈন্য ছিল না। পুলিশ ছিল না। জাতীয় সরকারে কাজ চালাবার মতো দক্ষ অফিসারও ছিল না। তখন পাকিস্তানে বন্দি কয়েক লক্ষ বাঙালি। ভারত থেকে ফিরে আসছে প্রায় এক কোটি বাঙালি উদ্বাস্তু– যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদারের অত্যাচারে দেশ ত্যাগ করেছিল। তখনই দরকার এদের জন্য রিলিফ আর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। ক্ষুধার্ত বাঙালিকে বাঁচানোর জন্য চাই অবিলম্বে খাদ্য। ওষুধ চাই। কাপড় চাই। চারদিকে এই চাই চাই আর নাই নাই– এর মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩। সময়ের হিসাবে মাত্র দুই বছর। এই দুবছরে আমরা কী পেয়েছি আর কী পাই নাই, আজ তারও খতিয়ান এবং আত্মবিশ্লেষণের দিন। আমি বড়ো দাবি করি না। আমরা কোনো ভুল করি নাই বা কোনো কাজে ত্রুটি হয় নাই– এমন কথাও বলি না। শুধু অনুরোধ করব, আপনাদের চারপাশে পৃথিবীর আরও অনেক দেশের ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। আমেরিকা পৃথিবীর সবচাইতে ধনী দেশ। এই আমেরিকাকেও স্বাধীনতা লাভের পর দুই দুইটি গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়েছে। আজকের অবস্থায় পৌঁছাতে আমেরিকার সময় লেগেছে প্রায় একশ বছর। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গড়ে তুলতে ৩০ বছর প্রত্যেকটি মানুষের একটানা কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। সোভিয়েত বিপ্লবের পর প্রথম পাঁচ বছরে দুর্ভিক্ষে মারা গেছে অসংখ্য লোক। সমাজতন্ত্রের শত্রু অসংখ্য লোককে প্রাণদণ্ড দিতে হয়েছে। নয়া চীন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের দীর্ঘদিন পরও খাদ্যে আত্মনির্ভর হয়নি। শ্রমিকদের অল্প মজুরি এবং বছরে দুই প্রস্থ কাপড় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমাদের প্রতিবেশী মিত্ররাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে এখনো চলছে গরিবি হটাও আন্দোলন।

দুর্ভিক্ষে যাতে মানুষ না মরে চেষ্টা করেছি। ভিক্ষা করে হলেও বিদেশ থেকে খাদ্য এনেছি। বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ছিল খালি। তবু পরনের কাপড়, রোগের ঔষধ আমদানির চেষ্টা করেছি। এক কোটি উদ্বাস্তুকে ছয় মাসে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে যতটা সম্ভব রিলিফ পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবচাইতে কম সময়ে ভাঙা রাস্তা, রেলব্রিজ মেরামত করা হয়েছে। পাকিস্তানিরা যে ভৈরব সেতু ভেঙে বাংলাদেশের যোগাযোগব্যবস্থা খতম করতে চেয়েছিল, তা আবার তৈরি করা হয়েছে। আমি জানি না, রক্তাক্ত বিপ্লবের পর পৃথিবীর আর কোনো দেশে সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন চালু করা হয়েছে কি না। আমার জানা মতে হয়নি। বাংলাদেশে তা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিপ্লবের এক বছরের মধ্যে সংবিধান তৈরি করেছে। নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে। ভোট দেওয়ার বয়স একুশের বদলে আঠারো বছর করে ভোটাধিকারের সীমানা বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের নিজস্ব বিমান এখন উড়ছে দেশ-বিদেশের আকাশে। তৈরি হয়েছে নিজস্ব বাণিজ্যিক জাহাজ বহর। বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত। স্থলবাহিনী মাতৃভূমির ওপর যে কোনো হামলা প্রতিরোধে প্রস্তুত। গড়ে উঠেছে আমাদের নিজস্ব নৌ ও বিমানবাহিনী। থানা ও পুলিশ সংগঠনের যে শতকরা ৭০ ভাগ পাকিস্তানি হানাদারেরা নষ্ট করেছিল, এখন আবার তা গড়ে উঠেছে। পাকিস্তানের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ সংস্থা, এমনকি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলেরও আমরা সদস্য। তাতেই প্রমাণিত হয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ আজ বাংলাদেশের পাশে। (সূত্র: মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬, পৃ. ৪৫২-৪৫৫, হারুণ-অর-রশিদ)।

স্বাধীনতা লাভের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ চরম দরিদ্র দেশ থেকে স্বল্পোন্নত দেশের পথে পা বাড়াতে সক্ষম হয়। কিন্তু ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তব রূপায়ণকে স্তব্ধ করে দেয়। সত্যের জয়কে প্রলম্বিত করা যায়; কিন্তু ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে দেশ সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে এক বিস্ময়ের নাম। ছোটো ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ১৬ কোটি মানুষের বসবাস সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখন খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল দেশ। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাসকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ থেমে থাকার নয়। কারণ, দেশের নেতৃত্বের ভার এখন বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার হাতে।

**লেখক: জাতীয় সংসদ সদস্য ও সমাজকর্মী**


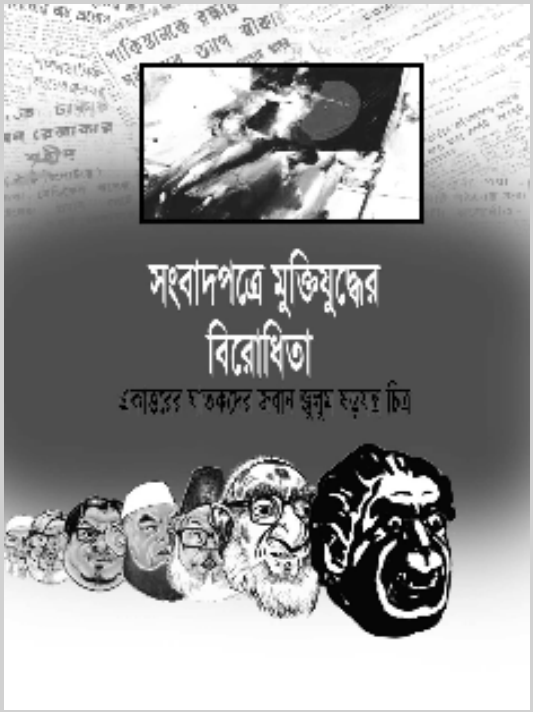


**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

# বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রে দোসর ও পরিকল্পনাকারী কারা?

**রেজা সেলিম**

গত বছরের ৩ জুলাই চীন সফরকালে বেইজিংয়ে একটি নাগরিক সংবর্ধনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, 'বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে। এবার যারা মূল পরিকল্পনাকারী ছিল, তাদেরও বিচার করা হবে।' আমরা সবাই জানি, এই দাবিটি বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের। শুধু দাবি নয়, প্রত্যাশাও। কারণ, যারা ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তাদের কিছু সদস্যের বিচার হয়েছে, কেউ কেউ দণ্ডপ্রাপ্তও হয়েছে। কিছু সদস্য বিদেশে প্রকাশ্যে এবং লুকিয়ে আছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করার চেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে অব্যাহত আছে। কিন্তু সাধারণের মনে একটি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে– এই কাজটি তো আর ওইদিন ভোরেই হয়নি; এর পেছনে দীর্ঘদিনের একটি পরিকল্পনা আছে। কিন্তু সে পরিকল্পনার পেছনের ও সামনের মানুষ কারা?

২০১৮ সালের ১৮ আগস্ট এক অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছিলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর আদালতে বিচার কার্যক্রম শেষ হলেও এখনো হত্যার পরিকল্পনাকারীদের বিচার হয়নি।' এছাড়া বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়টি আলোচনায় আসছে– কারা এই ঘটনার পেছনে ছিল, তাদের পরিচয় কী? ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সংঘটনকালের তদন্ত ও বিচারের ফলে সংঘটনকারীদের সম্পর্কে জানা গেলেও এই কাজের মূল হোতারা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে কিছু কিছু অনুমাননির্ভর ও কিছু বাস্তবিক গবেষণা এবং নানা পর্যায়ের অনুসন্ধানের ফলে যেসব তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বা আমাদের কাছে আছে তাতে স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে আসা কঠিন নয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনাকারীদের একটি বড়ো অংশ ইতোমধ্যে আমাদের পূর্বসূরি অনেকের গবেষণা সূত্রজালের আওতায় এসেছে। কিন্তু আমরা নানা কারণে তা স্পষ্ট করে বলছি না বা বলতে পারছি না। ধরুন, যদি আমরা খন্দকার মোশতাকের দিকেই তাকাই আর মনে করি তিনিই সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী (কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের দেশপ্রেমিক ঘোষণা করে তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন বা হতে পেরেছিলেন), তাহলে ষাটের দশক থেকে বঙ্গবন্ধু ও দলের প্রতি তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে একটি সরল পরিকল্পনাচিত্রও উন্মোচিত হয়। সে চিত্রপট উন্মোচন করে কেউ কেউ বলছেন মোশতাক আসলে ব্যবহৃত হয়েছিলেন। আমার অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানের ধারণা মোশতাকের প্রতি এতে সহানুভূতি তৈরি করার একটি চেষ্টা হয়ে যায়, আর তাতে প্রকৃত ও অপরাপর পরিকল্পনাকারীদের আড়ালে থাকার সুবিধা হয়।

প্রাথমিক সূত্রে মোশতাকের কর্মজীবন, রাজনৈতিক আদর্শচিন্তা ও তৎপরতা নিয়ে আমাদের প্রচুর তথ্য অনুসন্ধান প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ফলে আমার ধারণা ও বিশ্বাস– বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনাকারীদের চেহারা উন্মোচনে মোশতাকের সূত্র ধরে এগোনো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সে পটভূমি তৈরি হয়েছিল ১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধু যখন ঢাকায় পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবসকে 'উৎসবের দিন হিসেবে নয়, উৎপীড়নের নিগড় ছিন্ন করার সংকল্প নেওয়ার দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দিলেন। সেই থেকে বঙ্গবন্ধু ২৩ বছর দৃঢ়চিত্তে বাংলার মানুষকে নিয়ে স্বাধিকার অর্জনের জন্য সামনে এগিয়ে গেলেন শুধু ওই একটি বক্তব্যেরই মৌলিক লক্ষ্যের দিকে। আমাদের কারোরই বোঝার ক্ষমতা এত দুর্বল নয় যে সেই 'উৎপীড়নের নিগড় ছিন্ন করার সংকল্প'ই এই হত্যাকাণ্ডের মূল পটভূমি। মোশতাকসহ ব্যক্তিবিশেষ দায়ী পরিকল্পনাকারীদের খুঁজতে আমাদের তাই তখন থেকেই শুরু করতে হবে।

দ্বিতীয় সূত্র হলো, বঙ্গবন্ধুর আদর্শচিন্তা ও লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম। ১৯৪৮ সালের পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস সামনে রেখে ১২ আগস্ট 'অধুনাবিলুপ্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের সদস্য ও পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা' হিসেবে বঙ্গবন্ধু যে বিবৃতি দেন, সেখানে আছে তাঁর আদর্শের চূড়ান্ত রূপরেখা। সেই আদর্শের বাস্তবায়ন ছিল তাঁর সারাজীবনের লক্ষ্য। তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনায় এই আদর্শের বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্ক বা যোগসাজশ ছিল, এতে কারও মনে সংশয় থাকা উচিত নয়। সে বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'এই স্বাধীনতা সব মানুষের জন্যে হয়নি (গণআজাদী নয়)?' এই বক্তব্যের মধ্যে কি এটা প্রমাণ হয় না যে, ২৮ বছর বয়সের এক তরুণ বাঙালি নেতা পাকিস্তান জন্মের এক বছরের মধ্যেই পাকিস্তান সৃষ্টির সব ইতিহাস, পটভূমিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। যার এই অমিতবিক্রম সাহস, তাঁকে তাহলে কারা মেরে ফেলার পরিকল্পনা করতে পারে? বরং তাদের দেরি হয়ে গিয়েছিল। আরও আগে মেরে ফেলতে পারলে হয়তো পাকিস্তান রক্ষা করা যেত; কিন্তু মোশতাকের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পুরস্কার কি জুটত? এসব উপাত্তভিত্তিক তত্ত্বজ্ঞান এখন আমাদের হাতে আছে। শুধু সিদ্ধান্তে আসা দরকার যাতে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা যায়।

তৃতীয় সূত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ছায়াতলে থেকেই মোশতাক নিজেকে পীরবাড়ির সন্তান পরিচয় রেখে ডান ভাবনার নেতা হিসেবে একটা বাতাস তৈরি করে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। আর তাকে ঘিরে যেসব অসাধু ব্যক্তি ও নেতার আনাগোনা ছিল, তাদের দায়ও কিন্তু কম নয়। কারণ দেখা যায়, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এদের অনেকেই মোশতাকের কূটচিন্তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিল, যারা '৭৫ সালের ঘটনাপ্রবাহ এমনকি এর পরেও নিজেদের অবস্থান বহাল রাখতে সমর্থ হয়েছিল। মহাকালের বিচারে খন্দকার মোশতাক ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে বটে; কিন্তু তাকে ঘিরে যাদের পদচারণা ছিল তাদের অনেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বা বঙ্গবন্ধু হত্যার বেনিফিশিয়ারিদের দলে নাম লেখাতে পেরেছেন। কিন্তু যোগসাজশের দায় যদি তাদের ওপরও পড়ে, আমাদের বিব্রত হওয়া চলবে না।

আমাদের জানা আছে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের পর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয় বঙ্গবন্ধু সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী, আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা এবং বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের বিতর্কিত সহচর এই খন্দকার মোশতাক আহমেদ। মোশতাক বিতর্কিত ছিলেন, এই তথ্য ইতিহাস সমর্থিত। কারণ, তিনি দলের মধ্যেই সন্দেহভাজন ছিলেন এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গড়ার প্রশ্নে একজন সক্রিয় উদ্যোগী ছিলেন। যে কারণে স্বাধীনতাযুদ্ধ প্রশ্নে অনমনীয় প্রবাসী সরকার তাকে কিছুটা নজরদারির মধ্যেও রেখেছিল।

প্রশ্ন হলো– ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়, খন্দকার মোশতাক কি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন, নাকি জেগে ছিলেন? নিশ্চয়ই জেগে ছিলেন। কারণ, ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি রেডিয়ো অফিসে যান এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো– তিনি নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিলেন? যদি এই প্রস্তুতি তার থেকেই থাকে, তাহলে তিনি জানতেন কী ঘটতে যাচ্ছে এবং এর পরে তার করণীয় কী হবে। মোশতাক যে সেই পরিকল্পনামাফিক কাজ করেছেন, ১৫ আগস্টের দিনভর তার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলে তা স্পষ্ট হয়।

তৃতীয় জিজ্ঞাসা হলো– তাহলে মোশতাক এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা জানতেন? কেন জানতেন? তাহলে তিনি নিশ্চিত ছিলেন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে তাকেই দায়িত্ব নিতে হবে? তাহলে এই পরিকল্পনায় মোশতাক কখন থেকে যুক্ত ছিলেন? ১৯৭১ সালের পূর্বোক্ত কনফেডারেশন কানাঘুষায় তার সমর্থন এবং প্রবাসী সরকারের নজরদারি ছাড়াও আরও কিছু বিষয় আমাদের তথ্যানুসন্ধানে হাতে এসেছে, যাতে মোশতাকের চারপাশে কিছু অসামরিক শক্তি সমর্থনের ছায়া দেখা যাচ্ছে– যা '৭৫ সালের মধ্যে অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে। ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরিকল্পনায় মোশতাকের সহায়তাকারী কিছু ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অনুসন্ধান করে ১৯৭২ সাল থেকে হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনার আভাস মিলছে। এসবের সূত্র ১৯৭০ সাল থেকে উৎসারিত তথ্যভিত্তিক– যা এই গবেষণায় প্রমাণিত হচ্ছে।

আমাদের তথ্যানুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, খন্দকার মোশতাক ১৯৭০ সালে তার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান। লন্ডনে তারা এটিএম ওয়ালী আশরাফের বাসায় উঠেন এবং চিকিৎসা দরকার হবে– এই মর্মে ভদ্রমহিলাকে সেখানে রেখে মোশতাক ঢাকায় ফিরে আসেন। এটিএম ওয়ালী আশরাফ লন্ডনপ্রবাসী ছিলেন এবং সাপ্তাহিক জনমত নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ১৯৭১ সালে তিনি ভারত সফরে যান এবং মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার রহস্যজনক ভূমিকা নিলে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ প্রবাসী সরকারকে তার সম্পর্কে সতর্ক করে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে লন্ডনে বসে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের সিদ্ধান্তে আরও কয়েকজনের সঙ্গে এই ওয়ালী আশরাফের নাগরিকত্ব বাতিল হয় এবং মোশতাক ২৭ আগস্ট ১৯৭৫ সালে তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়। ওয়ালী আশরাফ পরে দেশে এসে মোশতাকের ডেমোক্রেটিক লীগে যোগ দেন। প্রশ্ন হলো– মোশতাকের সঙ্গে ওয়ালী আশরাফের এই সম্পর্কের ভিত্তি ও পটভূমি কী? ওয়ালী আশরাফের পিতা মৌলবি আতিকুল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মহকুমার বাঞ্ছারামপুরের মুসলিম লীগের একজন নেতা ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করেন। দেশ স্বাধীন হলে মুক্তিযোদ্ধারা তাকে আটক করেন; কিন্তু তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাদের হস্তক্ষেপে ছাড়া পান। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের ভাষ্য অনুযায়ী মোশতাক এই নির্দেশনা প্রদান করেন। আতিকুল্লাহর সঙ্গে মোশতাকের ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কের কারণে ওয়ালী আশরাফ তাকে চাচা বলে সম্বোধন করতেন।

প্রশ্ন হলো– ওয়ালী আশরাফ ও মোশতাকের সম্পর্কের ভিত্তি যদি একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও পারিবারিক হয়, তাহলে মোশতাক কি তাকে আস্থাভাজন মনে করতেন? সেই আস্থার সম্পর্ক কি এমন পর্যায়ের ছিল যাতে ওয়ালী আশরাফ দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন, যে কারণে তার নাগরিকত্ব পর্যন্ত হারাতে হয়েছিল? সে ষড়যন্ত্রে নিশ্চয়ই মোশতাকের মদত ছিল, না-হলে প্রবাসে এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য কী ছিল? দুইয়ে দুইয়ে চার মিলছে, যখন দেখা গেল পরের কালে এই ওয়ালী আশরাফ মোশতাকের হাতেই নাগরিকত্ব ফিরে পেয়েছিলেন এবং মোশতাকের দলে যোগ দিয়ে প্রকারান্তরে তার হাতকেই শক্তিশালী করেছিলেন। মোশতাকের জনবিচ্ছিন্ন ও ঘৃণিত জীবনে ডেমোক্রেটিক লীগ বিলুপ্ত হয় এবং ওয়ালী আশরাফ বিএনপিতে যোগ দেন। ১৯৮৮ সালের এরশাদের লোকদেখানো নির্বাচনে বাঞ্ছারামপুর থেকে স্বতন্ত্র এবং পরে একই আসনে ১৯৯১ সালে বিএনপির এমপি হন। ১৯৯৪ সালে তিনি মারা যান।

এখন আমাদের জানা দরকার বঙ্গবন্ধুর মতো মহানুভব ব্যক্তিত্বকে কেন কতিপয় ষড়যন্ত্রকারীর নাগরিকত্ব বাতিল করতে হয়েছিল? এদের তৎপরতা নিশ্চয়ই সে পর্যায়ের ছিল, যা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

> বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'এই স্বাধীনতা সব মানুষের জন্যে হয়নি (গণআজাদী নয়)?' ... এক বছরের মধ্যেই পাকিস্তান সৃষ্টির সব ইতিহাস, পটভূমিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। যার এই অমিতবিক্রম সাহস, তাঁকে তাহলে কারা মেরে ফেলার পরিকল্পনা করতে পারে?

দেখতে হবে আওয়ামী লীগের আরেক নেতা কাজী জহিরুল কাইয়ুমের ভূমিকা, যা ১৯৭১ সালে কিসিঞ্জারের নজরে পর্যন্ত পড়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৩০ জুলাই মোশতাকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজী জহিরুল কাইয়ুম কলকাতায় মার্কিন দূতাবাসে যোগাযোগ করেন। তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের সংসদ সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত জাতীয় পরিষদের পূর্বাঞ্চলীয় জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। কাজী জহিরুল কাইয়ুমের তৎপরতা নিয়ে ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট কলকাতার মার্কিন কনসুলেট থেকে যে গোপন তারবার্তাটি পাঠানো হয়েছিল, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে– দূতাবাসের রাজনৈতিক কর্মকর্তার (পলিটিক্যাল অফিসার) সঙ্গে আলোচনায় আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য উদ্‌গ্রীব এবং পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার দাবিতে ছাড় দিতে প্রস্তুত ... তিনি সুপারিশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত-পাকিস্তান ও আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে একটি শীর্ষ বৈঠকের ... তিনি দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র পরাশক্তি যারা এই পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম। বার্তায় কনসুলেট জেনারেল গর্ডন তার মন্তব্যে লিখেন, 'আমরা অবাক হয়েছি বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রচারণার সঙ্গে তার মতামতের বৈপরীত্য দেখে। আমাদের ধারণা, বর্তমান ঝঞ্ঝাটময় পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব হাতের পাঁচ হিসেবে বিকল্প উপায় খুঁজছে আর এ সুবাদেই তারা একটা সমঝোতায় আসার জন্য উদ্‌গ্রীব এবং সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। যদিও কাইয়ুমের দাবি, নির্বাচিত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মনোভাবই তিনি ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু সত্যিই শীর্ষ নেতারা এমন সমঝোতামূলক ভাবনা ভাবছেন কি না, সেটা নিশ্চিত করা জরুরি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কাইয়ুমকে জানিয়েছেন, আমরা এই বৈঠকের খবর উপরের মহলে নিশ্চিতভাবেই জানাব, তবে তাকে কোনো ধরনের পালটা সাড়া আশা করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কাইয়ুম ইঙ্গিত দিয়েছেন পরের সপ্তাহে আবার যোগাযোগ করার। আমাদের উচিত হবে তার সঙ্গে গোপনে এবং নিম্ন পর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। এ বিষয়ে পরবর্তী টেলিগ্রামে সংযুক্ত ঢাকা কনসুলেটের তারবার্তাটি উল্লেখ করা যেতে পারে: The Consulate General in Dacca did an assessment of Qaiyum's role in the Awami League and concluded that he was not prominent in the leadership but was probably a confidant of Khondkar Mushtaq Ahmad, the 'Foreign Minister' of the Bangladesh independence movement, and a bona fide representative of Mushtaq. (Telegram 3057 from Dacca, August 8; National Archives, RG 59, Central Files 1970-73, POL 23-9 PAK)

এখন প্রশ্ন হলো– কাজী জহিরুল কাইয়ুমের এই ভূমিকা কতটা মোশতাকের (মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী) আনুকূল্যে হয়েছিল? এদের এই উদ্যোগই কি কিসিঞ্জারকে কনফেডারেশনের খোরাক জুগিয়েছিল? তাহলে মোশতাক এবং তার সহযোগীদের এসব ভূমিকা বঙ্গবন্ধু কেন আমলে নিতে পারেননি? নিশ্চয়ই পরিকল্পনাকারীদের সেখানেও কোনো ভূমিকা ছিল! এছাড়া যারা ১৯৭১ এবং পরবর্তীকালে সরকারের আনুকূল্যে ছিলেন, যেমন– তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও মাহবুব আলম চাষী, তাদের ভূমিকা বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে মিলছে। মাহবুব আলম চাষীর ভূমিকা ব্যাপক আলোচিত হলেও আরও অনেকের ভূমিকা এই আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে।

আমাদের আরও যেসব বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান চালাতে হবে সেখানে হয়তো এমন অনেকের নাম আসবে, যাতে আমরা কেউ কেউ বিচলিতবোধ করব। কিন্তু আমাদের প্রজন্মের বড়ো দায় হলো ইতিহাসকে তার আপন গতিতে চলতে দিতে সঠিক সময়ে সঠিক দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারিনি। দেশকে সে দায় থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি আমাদের নিজেদেরও দায়মুক্তি চাই। আর চাই– বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনা যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের ইতিহাসকে কলঙ্কের দায় থেকে মুক্তি দেয়। আমরা কৃতজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিকল্পনাকারীদের বিচারের কথা বলে আমাদের সেই দায়মোচনের সুযোগ করে দিতে চাইছেন।

**লেখক: পরিচালক, আমাদের গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প**

# জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড ষড়যন্ত্র দেশে-বিদেশে

**শ্যামল দত্ত**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফেরার পর ১৮ জানুয়ারি সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'যে মানুষ মরতে রাজি, তাঁকে কেউ মারতে পারে না। আপনি একজন মানুষকে হত্যা করতে পারেন। সেটা তো তাঁর দেহ। কিন্তু তাঁর আত্মাকে কি আপনি হত্যা করতে পারেন? না তা কেউ পারে না। এটাই আমার বিশ্বাস।' একই বছরে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এনবিসি টেলিভিশনের সাংবাদিক পল নিক্সনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি পেয়েছি কোটি কোটি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস আর ভালোবাসা। যেদিন এই মানুষের জন্য আমার জীবন দিতে পারব, সেদিন আমার আশা পূর্ণ হবে, এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা করি না।'

এই দুই বিদেশি সাংবাদিককে দেওয়া দুটি সাক্ষাৎকার শুনলে মনে হয় দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য জীবন দেওয়ার এক চরম আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপরিচালনা শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন বাঙালির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা যখন অর্জিত হলো, এর মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় প্রাণ দিতে হলো তাঁকে। তিনি বিশ্বাস করতেন না, কোনো বাঙালি তাঁকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু তিনি জানতেন না, এই বাঙালিদের মধ্যে কারও কারও শরীরে বইছে মীরজাফরের রক্ত। তাই ২৩ বছরের সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীন বাংলার মাটিতে তাঁকে জীবন দিতে হলো সেই নব্য মীরজাফরদের হাতে। জাতির পিতার রক্তে রঞ্জিত হলো তাঁরই স্বপ্নের সোনার

বাংলা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রচিত হলো সেই বিশ্বাসঘাতকতার কালো ইতিহাস।

তাই বাঙালির জীবনের সবচেয়ে এক অন্ধকারতম দিনের নাম ১৫ আগস্ট। এক নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের নাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা। এক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিলিত চক্রান্তের নাম একজন জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন। শুধু বাঙালির ইতিহাস নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম জঘন্যতম ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় কোনো নজির নেই। ৩০ লাখ শহিদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত যেই দেশ, সেই যুদ্ধের যে মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁকেই হত্যা করা হলো তাঁর নিজের বাসভবনে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁকে হত্যা করতে সাহস পায়নি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীরা সেই ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল মাত্র সাড়ে চার বছরের মাথায়, তাঁকে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

## পিতা, ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সুবিধাভোগীরা। রাষ্ট্র চলেছে ১৯৭১-পূর্ববর্তী পাকিস্তানি ভাবধারায়। জাতির পিতার স্বপ্নের দেশ লুণ্ঠিত হয়েছে এই সুবিধাভোগীদের হাতে। বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং পরবর্তী সময়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের স্ত্রী তার রাজনৈতিক উত্তরসূরি খালেদা জিয়ার শাসনামল– এই দীর্ঘ ২৩ বছর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে জাতির পিতাকে হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারী ও হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী সুবিধা লাভকারীদের দ্বারা। দীর্ঘ এই সময়ে বঙ্গবন্ধুর নাম নেওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। ইতিহাস থেকে জাতির পিতার নাম-নিশানা মুছে ফেলার সুপরিকল্পিত নানা অপচেষ্টা করা হয়েছে। কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারপ্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়েছে। ১৫ আগস্টের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডে শুধু বঙ্গবন্ধু নয়, হত্যা করা হয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু শেখ রাসেল, শেখ আবু নাসের, সুলতানা কামাল খুকু, পারভীন জামাল রোজী, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মনি, বেগম আরজু মনি, কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ, আবদুল নঈম খান রিন্টু, বেবী সেরনিয়াবাত, আরিফ সেরনিয়াবাত, শহীদ সেরনিয়াবাত ও সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবুকে। জাতির পিতা থেকে শুরু করে ১০ বছরে শিশু– কেউ-ই বাদ যাননি এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড থেকে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ইতিহাসের মহানায়ক' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'যে নেতার বুকভরা ছিল গভীর ভালোবাসা, বাংলার মানুষ, বাংলার আকাশ-বাতাস, মাটিকে যিনি গভীর ভালোবাসায় সিক্ত করেছিলেন, সেই বাংলার মাটি তাঁর বুকের রক্তে ভিজে গেল কয়েকজন ঘাতক ও বেইমানের চক্রান্তে।' বঙ্গবন্ধু কখনো বিশ্বাস করতেন না এই বাঙালি তাঁকে কখনো হত্যা করতে পারে। তাই দেশের রাষ্ট্রনায়ক হয়েও সাদামাটা নিরাপত্তাহীন এক বাসভবনে তিনি বসবাস করতেন। ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের এই বাড়িটি এখন বঙ্গবন্ধুর উদারচিন্তা আর ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের কালরাত্রির সাক্ষী হয়ে আছে। এই বাড়ির সিঁড়িতেই লুটিয়ে পড়েছে ঘাতকের বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত জাতির পিতার লাশ। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর হওয়া এই বাড়িটি ঘাতকদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন ও নৃশংসতার উদাহরণ হিসেবেই থাকবে আগামী সময়।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬– দীর্ঘ ২১ বছরের নানা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বাঙালির ইতিহাসের এই মহানায়ককে মানুষের হৃদয় থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা অপচেষ্টাই ছিল মাত্র। যে বাংলার মাটিতে মিশে আছে বঙ্গবন্ধুর প্রাণ, সেই মাটির গন্ধ তো আর বদলে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে শুয়ে থেকেও তিনি জাগ্রত ছিলেন এবং এখনো আছেন বাঙালির অন্তরের আলো হয়ে। তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মনে চেতনার বাতিঘর হিসেবে তিনি জাগ্রত আছেন। তাই তিনি থেকেও ছিলেন আলোকবর্তিকার মতো, না থেকেও আছেন বাঙালির হৃদয়জুড়ে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সুবিধাভোগীরা। ... জাতির পিতার স্বপ্নের দেশ লুণ্ঠিত হয়েছে এই সুবিধাভোগীদের হাতে

## হত্যাকাণ্ডের বিচার: অন্ধকার ভেঙে আলোর পথে যাত্রা

১৯৯৬ সালে ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার করা। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তার পূর্বসূরি খন্দকার মোশতাকের করা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে যে সংসদীয় বৈধতা দেওয়া হয়েছিল, তা উপড়ে ফেলে বিচারের পথ উন্মুক্ত করা। এই অধ্যাদেশটি জারি হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে দায়মুক্তি দিয়ে। ১৯৭৯ সালে জেনারেল জিয়ার অধীনে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের পর এই অধ্যাদেশকে আইনের বৈধতা দেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর সপ্তম জাতীয় সংসদে ২১ বছর পর এই কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল আইন পাস হয় জাতীয় সংসদে, ফলে বিচারের পথ উন্মুক্ত হয়। এই বছরের ২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী আ ফ ম মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে ধানমন্ডি থানায় ২৪ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ শুনানি শেষে ১৯৯৮ সালে ৮ নভেম্বর তৎকালীন ঢাকার দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়ে রায় দেন। নিম্ন আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে আসামিদের আপিল ও মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিতকরণের শুনানি শেষে ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্ট দ্বিধাবিভক্ত রায় দেন। ২০০১ সালে ৩০ এপ্রিল হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চ ১২ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে তিনজনকে খালাস দেন। এরপর ১২ আসামির মধ্যে প্রথমে চারজন এবং পরে আরেকজন আসামি আপিল করে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায়

আসার পর দীর্ঘ ছয় বছর আপিল শুনানি না হওয়ায় আটকে যায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে আপিল বিভাগে একজন বিচারপতি নিয়োগ দেওয়ায় এই মামলার কার্যক্রম আবার শুরু হয়। ২০০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বে আপিল বেঞ্চ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৫ আসামির লিভ টু আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেন। দীর্ঘ এক বছর পর ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালের ১৯ নভেম্বর ১২ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে চূড়ান্ত রায় দেন আপিল বিভাগ। ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৫ আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। এরা হলো– ১. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, ২. কর্নেল বজলুল হুদা, ৩. ল্যান্সার মহিউদ্দিন আহমেদ, ৪. আর্টিলারি মহিউদ্দিন ও ৫. সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান। বাকি সাত আসামি ওইসময়ে পলাতক ছিল। এ বছরের ১২ এপ্রিল রাজধানীর মিরপুর থেকে গ্রেফতার হওয়া আরেক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। এখনো পলাতক ৬ আসামির মধ্যে খন্দকার বজলুর রশিদ ও মেজর শরিফুল হক ডালিম পাকিস্তানে, এম রাশেদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে, এসএইচএমবি নূর চৌধুরী কানাডায় এবং রিসালদার মোসলেমউদ্দিন ভারতে পলাতক আছে বলে খবর রয়েছে। অন্য এক আসামি আবদুল আজিজ পাশা ২০০১ সালে জিম্বাবুয়েতে মারা গেছে বলে জানা যায়।

## বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড: ষড়যন্ত্র ছিল দেশে ও বিদেশে

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনার পর পুরো জাতি যখন হতচকিত, তখন অনেকেই মনে করতেন এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিছকই সেনাবাহিনীর একদল উচ্চাভিলাষী জুনিয়র ও মধ্যম স্তরের সেনা সদস্যের কাজ। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরপর ক্ষমতা গ্রহণকারী খুনি মোশতাক-চক্র এভাবেই একটি ধারণা দেওয়ার অপচেষ্টাই করেছিল অত্যন্ত সুচতুরভাবে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক ও সেনা নেতৃত্বের কোনো যোগসাজশ নেই, কোনো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বিষয় এটা ছিল না। নিজেদের দায় এড়ানো এবং আন্তর্জাতিক সমালোচনা সামলানোর লক্ষ্য নিয়ে এই প্রচারণা চালানো হয়েছিল সুকৌশলে। বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করা, দেশের মধ্যে যাতে কোনো জনপ্রতিরোধ গড়ে না ওঠে তা মোকাবিলা করা, সর্বোপরি ষড়যন্ত্রের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রকে আড়াল করার উদ্দেশ্যেই অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে এটা করা হয়েছিল। পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডে জড়িত সেনা কর্মকর্তারা পরবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর থেকে আসল নায়করা ক্ষমতার মঞ্চে আবির্ভূত হতে শুরু করে। ক্ষমতার বলয় থেকে ছিটকে পড়ে হত্যাকারীরা, যারা এতদিন ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে বঙ্গভবন থেকে পুরো দেশ নিয়ন্ত্রণ করছিল। এরপর অভ্যুত্থান-পালটা অভ্যুত্থানে খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের আসল নায়করা।

ক্ষমতার কেন্দ্রে তখন চলে আসে জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদ গং। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত দেশীয় চক্রান্তকারীদের গ্রুপটিও তখন কোণঠাসা হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীদের মূল লক্ষ্য অর্জিত হওয়ায় তারা নিজেরাই চলে যায় আড়ালে। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম সত্য হচ্ছে– ইতিহাস চাপা থাকে না। সত্য উন্মোচিত হয় মিথ্যার আড়াল থেকে। এক মনীষী বলেছিলেন, তিনটি জিনিসকে কখনো চাপা দিয়ে রাখা যায় না। এই তিন জিনিস হলো– চন্দ্র, সূর্য ও সত্য। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়া, গবেষণা ও নানা লেখালেখিতে উন্মোচিত হতে থাকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ভয়ংকর বিভিন্ন দিক। দেশি ও বিদেশি লেখক, গবেষক ও সাংবাদিকরা এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ কথা সত্য যে, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ষড়যন্ত্রের পথেই চলে। চলতে চলতে খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে আসল চক্র, উন্মোচিত হয় প্রকৃত ঘটনা। ঘটনার পরম্পরা বিশ্লেষণ করে গভীর অনুসন্ধান করলেই বেরিয়ে আসে আসল সত্য। সেই ইতিহাসের অমোঘ সত্যের বিশেষিত জায়গাগুলো এখন তুলে ধরতে চাই। যার ঘটনাপরম্পরা বিশ্লেষণ বঙ্গবন্ধু হত্যার ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের অন্ধকার দিকটিকে আলোতে নিয়ে আসে।

## বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড: যুক্তরাষ্ট্রের নীরব সমর্থন

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত মুজিবনগর সরকারের সময় খন্দকার মোশতাক-চক্র কলকাতার মার্কিন কনসুলেটের মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু তখন থেকেই। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা যখন লড়াইয়ে লিপ্ত, অসংখ্য মানুষের রক্তে যখন রঞ্জিত বাংলার মাটি, মুক্তিকামী মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, পররাষ্ট্র সচিব মাহবুল আলম চাষী, মোশতাকের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা কুমিল্লার এমপি জহুরুল কাইয়ুম ও তাহেরউদ্দিন ঠাকুর কলকাতায় মার্কিন কনসাল জোসেফ ফারল্যান্ডের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ঠেকাতে কনফেডারেশনের প্রস্তাব নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। তাদের এই তৎপরতা ভারতের গোয়েন্দাদের নজরে আসার পর তাজউদ্দীনের নেতৃত্বাধীন মুজিবনগর সরকারে তাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। ইতিহাসের নির্মম সত্য হচ্ছে– বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার এই চক্রান্তের নায়করা ১৫ আগস্ট সকালেই সশরীরে উপস্থিত শাহবাগ রেডিয়ো স্টেশনে। বঙ্গবন্ধু সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক মাহবুল আলম চাষী উপস্থিত খুনিচক্রের সঙ্গে। ১৯৭১ সালে তারা যেটা করতে সফল হয়নি, ১৯৭৫ সালে সফল হয় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে। তারপরের ইতিহাস সবার জানা। মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফসুলজ ও সাংবাদিক কাই বার্ড অনুসন্ধান করে দেখিয়েছিলেন, এই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রক্রিয়ায় কীভাবে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বোস্টার ও সিআইএ'র স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরি জড়িত ছিলেন। ১৯৯৯ সালে নিউইয়র্কের ডেইলি মেইল পত্রিকায় এ দুই মার্কিন সাংবাদিকের লেখা 'বাংলাদেশ, এনাটমি অব এ ক্যু' প্রবন্ধে বিস্তারিত এর বিবরণ আছে। ১৯৭৫ সালে জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী ফারুক রশীদ গং মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাদের বলা হয়, তারা যদি তাদের অভিযানে সফল হয়, তাহলে সমর্থন দেবে। আর ব্যর্থ হলে তারা পুরো বিষয়টিই অস্বীকার করবে।

আরেক ব্রিটিশ সাংবাদিক ক্রিস্টোফার হিছেন তার গবেষণামূলক গ্রন্থ 'দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার' গ্রন্থে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে লিখেছেন, বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকারকে উৎখাতের প্রক্রিয়ায় তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন তথা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সম্মতি ছিল। হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭৩ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৭১ সালেই হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানের সামরিক জান্তার জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে আশ্বস্ত করেন যে, ভারতে

মুজিবনগর সরকারের একটি অংশ স্বাধীনতার দাবি পরিত্যাগ করে সমঝোতা করতে আগ্রহী। কয়েক বছর আগে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের যে গোপন দলিল উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাতে দেখা যায়, ১৯৭১ সালের ১১ আগস্ট হোয়াইট হাউসে নিক্সন, কিসিঞ্জার ও অন্যদের এক বৈঠকে তৎকালীন মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট জন আরউইনের দেওয়া এক রিপোর্টে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে ভারতের মার্কিন দূতাবাসের রাজনৈতিক কর্মকর্তা জর্জ গ্রিফিনের এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের এই আলোচনার কথা তার উপদেষ্টা জিডব্লিউ চৌধুরীকে জানান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক দিলারা চৌধুরীর স্বামী জিডব্লিউ চৌধুরী বা গোলাম ওয়াদুদ চৌধুরী তার লেখা বই 'দ্য লাস্ট ডেইজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান' গ্রন্থে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে যুদ্ধ ছাড়াই সমাধান হবে বলে মার্কিন প্রশাসনের আশ্বস্ত করার খবর উল্লেখ করেন। সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন চলাকালে খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদলের যুক্তরাষ্ট্র সফর করার কথা ছিল এবং নিউইয়র্কে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে মার্কিন ও পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় গোয়েন্দাদের হাতে মোশতাকের এই চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন প্রতিনিধিদলে পরিবর্তন আনেন। খন্দকার মোশতাকের পরিবর্তে পরবর্তী সময়ে লন্ডন থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ভিন্ন একটি প্রতিনিধিদলকে নিউইয়র্কে পাঠানো হয়। এরপর থেকে খন্দকার মোশতাককে মুজিবনগর সরকারে একেবারে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়।

অন্যদিকে মার্কিন কংগ্রেসম্যান স্টিফেন জে সোলার্জ ১৯৮০ সালের ৩ জুন সাংবাদিক লরেন্স লিফসুলজকে লেখা এক চিঠিতে জানান, হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির এক তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু শাসনামলের বিরোধিতাকারীরা ১৯৭৪ সালের নভেম্বর এবং ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। লরেন্স লিফসুলজ লিখেছেন, ঢাকায় বাংলাদেশি সামরিক কর্মকর্তাদের দুটি গ্রুপ জুনিয়র অফিসার যারা হত্যাকাণ্ড ঘটাবে, অন্যদিকে জিয়াউর রহমানের মতো সিনিয়র অফিসার গ্রুপ যারা ভবিষ্যতে নেতৃত্ব নেবে– উভয় গ্রুপই মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। দূতাবাস থেকে বলা হয়, মুজিবকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিলে তাদের কোনো সমস্যা নেই।

## বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড: পাকিস্তানের ভূমিকা

আন্তর্জাতিক চাপে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেও পাকিস্তান মনেপ্রাণে কখনো বাংলাদেশের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে পারেনি। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছে কনফেডারেশন-জাতীয় কিছু একটা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ঠেকানো যায় কি না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে কোনোভাবেই এ ধরনের কোনো উদ্যোগে রাজি করানো যায়নি। ঢাকায় রেসকোর্সে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা ও পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান সেনা কমান্ডার জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর মধ্যে পরাজয়ের দলিল স্বাক্ষরের পরও এই চেষ্টা অব্যাহত ছিল। এমনকি ১৯৭৩ সালে প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করেছিল, তাতে বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে উল্লেখ করে একদিন দখলমুক্ত হয়ে আবার পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ ছিল চরম। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জাতিসংঘ ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য মিত্রদেশ দিয়ে এই চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন, যাতে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শেষ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত না নেয়। অনেকের মতে, পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাকর্মী হত্যা করলেও পাকিস্তানিদের হাতে আটক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করার দুটি কারণ ছিল। এক. বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার সব সম্ভাবনা তখনই শেষ হয়ে যাবে। দুই. মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানকে আশ্বস্ত করেছিল, খন্দকার মোশতাক গংয়ের সঙ্গে মুক্তির সংগ্রাম বাদ দিয়ে যুদ্ধবিরতির যে আলোচনা তারা চালাচ্ছিলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলে সেই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো কিংবা মার্কিন শাসকদের এ দুই প্রচেষ্টার কোনোটাই সফল হয়নি বঙ্গবন্ধুর অনড় ভূমিকা ও মার্কিন-মোশতাক ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার আগ মুহূর্তে বলেছিলেন, তার জীবনের বড়ো ভুল ছিল, শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখা। ৮ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধুকে ৪ জানুয়ারি থেকে মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে মুক্ত করে রাওয়ালপিন্ডির একটি গেস্ট হাউসে আনা হয়। এখানে আগে থেকে অবস্থান করেছিলেন ড. কামাল হোসেন। ড. কামাল হোসেন তার বইয়ে লিখেছেন, এই চারদিনে জুলফিকার আলী ভুট্টো কয়েক দফা চেষ্টা করেছেন বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে যে কোনোভাবে দুই পাকিস্তানের একসঙ্গে থাকার একটি যৌথ ঘোষণা দেওয়া যায় কি না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে কোনোভাবে এ ধরনের ঘোষণায় সম্মত করানো সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমি নয় মাস পাকিস্তানে বন্দি, আমি কিছুই জানি না বাংলাদেশে কী ঘটেছে। আমাকে বাংলাদেশে যেতে হবে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তারপর এ বিষয়ে কথা বলতে পারব। এর মধ্যে ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে নেওয়ার জন্য ব্রিটিশ রয়েল এয়ার ফোর্সের বিশেষ বিমান এসে উপস্থিত হওয়ায় পাকিস্তানিরা হাল ছেড়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

৮ জানুয়ারি অপরাহ্নে লন্ডন পৌঁছে বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েও একই কথা বলেন। ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে রেসকোর্স ময়দানে যে বক্তৃতা দেন, তাতে এ বিষয়ে আলোচনার দরজা চিরতরে বন্ধ করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, ভুট্টো দুদেশের মধ্যে একটি শিথিল সম্পর্ক রাখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, এ ব্যাপারে আমি এখন কিছু বলতে পারব না। এখন আমি বলতে চাই, আপনি আপনার দেশ নিয়ে শান্তিতে থাকুন, বাংলাদেশ এখন স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে। ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে– পাকিস্তান-মার্কিন এবং দেশীয় দোসরদের চক্রান্তে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর প্রথম অভিনন্দনটি আসে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছ থেকে। বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করার অভিনন্দন জানিয়ে ভুট্টো ইসলামি সংস্থায় সব সদস্য এবং তৃতীয় বিশ্বের সব দেশের প্রতি অনুরূপ আহ্বান জানান। তিনি শুভেচ্ছা হিসেবে 'বাংলাদেশি মুসলমান ভাইদের' জন্য ৫০ হাজার টন চাল ও ১০ মিলিয়ন গজ কাপড় পাঠানোর সিদ্ধান্তও দেন। ভুট্টোর এই

পদক্ষেপ কি নিছক কূটনৈতিক কার্যক্রম না একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ, তা নিয়ে নানা বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বাংলাদেশে ঘটল, তাতে ভুট্টো যে শুধু নীরব দর্শক ছিল না, ১৫ আগস্টের পূর্বাপর ঘটনা তা-ই প্রমাণ করে। কারণ, ১৯৭৫ সালে ১৮ এপ্রিল কাকুলে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেছেন, শিগগিরই এই অঞ্চলে কিছু বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। ১৯৭৪ সালের জুনে ১০৭ সদস্যের প্রতিনিধিদলসহ ভুট্টোর বাংলাদেশ সফরের পর তার সফরসঙ্গী এক সাংবাদিক দেশে ফিরে গিয়ে করাচির ডেইলি নিউজ পত্রিকায় বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলের সম্ভাবনার কথা লেখেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারপ্রক্রিয়ায় বিজ্ঞ দায়রা জজ থেকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ পর্যন্ত মামলা দায়ের ও রায় চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন আদালতে মোট চারটি রায় প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে মামলা দায়ের থেকে ২০১০ সালে ফাঁসি কার্যকর পর্যন্ত এই রায়গুলো দিয়েছেন ঢাকা জেলার দায়রা জজ বিচারক কাজী গোলাম রসুল, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ডেথ রেফারেন্স ও আপিল শুনানির বিভক্তির রায় দিয়েছেন বিচারপতি এমএম রুহুল আমিন ও বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক, পরবর্তীকালে তৃতীয় একক বেঞ্চ বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিমের বেঞ্চের রায় এবং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বে ৫ জন বিচারপতির অভিন্ন ও চূড়ান্ত রায়।

প্রতিটি রায়ের পর্যবেক্ষণ অংশে সপরিবারে দেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ঘটনা শুধু একটি নিছক হত্যাকাণ্ড ছিল না বলে উল্লেখ করা হয়। এই হত্যাকারীদের বিচারের পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য নায়ক ও ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচনের জন্যও মতামত দেওয়া হয়। ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের দিকটি বিবেচ্য ছিল না বিধায় এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের সুবিধাভোগী ও ষড়যন্ত্রের নেপথ্যের কুশীলবরা বরাবরের মতো আড়ালেই থেকে গেছে। বিচারকদের পর্যবেক্ষণে পৃথক ও সঠিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উন্মোচনের আহ্বান জানানো হয়। হত্যা, ক্যু ও অসাংবিধানিক পথে ক্ষমতা দখলের পথ চিরতরে বন্ধ করতে হলে ষড়যন্ত্রের কানাগলিতে ঘুরতে আগ্রহীদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। তাই আজ দাবি উঠেছে, পৃথক একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা, জাতীয় চার নেতাকে জেলখানার ভেতরে হত্যার তদন্তের জন্য এক ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করা এবং কেন্দ্রীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের মুখোমুখি করা। অন্যথায় বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে তাঁর কয়েকজন হত্যাকারীর বিচার হলেও ষড়যন্ত্রের দিকটি উন্মোচিত না হলে তাঁর রক্তের ঋণ আমরা কখনো শোধ করতে পারব না।

শেষ করব ব্রিটিশ সাংবাদিক ক্রিস্টোফার হিছেনের লেখা 'দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার' গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। হিছেন লিখেছেন, '১৯৭১ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত গণহত্যায় প্রত্যক্ষ ইন্ধন এবং ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ঘটনায় পরোক্ষ সম্মতি দিয়ে যে ঘৃণ্য অপরাধ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার করেছেন, এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং এই প্রমাণ দিয়েই কিসিঞ্জারকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো সম্ভব।' একজন বিদেশি সাংবাদিক যদি এই দাবি তুলতে পারেন, তাহলে আমরা বাংলাদেশিরা কেন এই দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে তাদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দাবি তুলব না?

**লেখক: সম্পাদক, দৈনিক ভোরের কাগজ, কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় প্রেস ক্লাব**

**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

# বঙ্গবন্ধু কেন জাতির পিতা

মোল্লা জালাল

খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন– একজন মানুষ কীভাবে একটি জাতির পিতা হয়? শুধু বাঙালি জাতিরই নয়, ইতিহাসে বহু দেশে বহু জাতিগোষ্ঠী অনেককেই জাতির পিতা হিসেবে সম্মান দেয়, সম্বোধন করে। এই উপমহাদেশের ভারতে মহাত্মা গান্ধী, পাকিস্তানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে জাতির পিতা মান্য করা হয়।

বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশযাত্রা বঙ্গবন্ধুর সময় থেকে নয়। বহু বছর আগে থেকে সভ্যতার ক্রমবিকাশে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে একটি মানবগোষ্ঠী ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক পরিবর্তন-পরিবর্ধনের লড়াই-সংগ্রামে টিকে থেকে জীবনাচারের মধ্য দিয়ে নিজেদের একটি সত্তার সৃষ্টি করে। জীবনাচারের বিভিন্ন অনুষঙ্গে এই সত্তার প্রকাশ ঘটে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনাচারের এই অনুষঙ্গ রূপ বদলায়। ক্রমাগতভাবে নতুনত্ব যুক্ত হয়। ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যতায় উপমহাদেশের এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়ে সর্বশেষ বাঙালি হিসেবে পরিচিতি পায়। এই বাঙালি জাতি হাজার বছর ধরে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও চালাকচতুর লোকদের দ্বারা শাসিত-শোষিত হয়েছে। অনেক বছর আগের কথা বাদ দিলেও সমসাময়িক সময়ের ইতিহাসে মোগল, পাঠান, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদেরও যদি বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাহলে দেখা যায় এরা প্রত্যেকেই বাংলায় এসেছে পঙ্গপালের মতো। এসে সব লুটেপুটে খেয়ে চলে গেছে, নয়তো বিতাড়িত হয়েছে। এই চলে যাওয়া বা বিতাড়িত এমনিতে হয়নি। অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি হাজার বছর ধরে লড়াই করেছে। যদি মোগল আমল থেকেও ধরা হয়, তা হলেও দেখা যায়, রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার বিবেচনায় সেই ঈশা খাঁ থেকে শুরু করে

পাকিস্তানের মোনায়েম খান পর্যন্ত সব শাসক পঙ্গপালের মতো এই বঙ্গভূমিকে বেশুমার লুটপাট করেছে। নানা কায়দায় বাঙালি জাতিসত্তার বিনাশ করতে চেয়েছে। শেষপর্যন্ত কেউ সফল হয়নি। অপরদিকে বাঙালি তার মানমর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতেও পারেনি। কোনো না কোনো পর্যায়ে সমঝোতা করতে হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ঈশা খাঁ এক অসীম সাহসী বীরযোদ্ধা হিসেবে মোগলদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও একপর্যায়ে তিনি ভাটির রাজা হিসেবে মোগলদের কাছ থেকে 'মসনদে-আলা' খেতাব নিয়ে সমঝোতা করতে বাধ্য হন। তিনি পারেননি বাঙালি জাতিকে তার কাঙ্ক্ষিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। ঈশা খাঁর বংশধররাও পারেনি। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস কারও অজানা নেই। ইঙ্গ-ফরাসি-পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিদের নানা ধরনের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বীর বাঙালির বীরত্বগাথার অনেক লড়াই-সংগ্রামের 'গল্প' ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। যুগে যুগে বাঙালি হয়েছে প্রতারিত। সর্বশেষ প্রতারণার নাম পাকিস্তান। ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান শেখ মুজিব। তার আগে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনেও তিনি ছিলেন অগ্রসেনানী। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মওলানা ভাসানী ও গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শুরু করেন জীবনপণ লড়াই। সোহরাওয়ার্দীর অবর্তমানে আন্দোলনের সব দায়িত্ব তুলে নেন নিজের কাঁধে। টানা ২৩ বছর বিরতিহীন আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বাঙলি জাতির মনে দুর্দমনীয় সাহস সঞ্চার করেন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গোটা জাতি প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায় জুলুম আর জালেমের বিরুদ্ধে। আর এই সাহসী সংগ্রামের আপসহীন নেতা হিসেবে তিনি হয়ে যান সব মানুষের 'বঙ্গবন্ধু'। বাঙালির ইতিহাসে ১৯৫২, '৫৪, '৬২, '৬৬, '৬৯ এবং '৭০ সালের ঘটনা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের একেকটি মাইলফলক। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি করে বিশ্বের মানচিত্রে একদিকে যেমন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেন, তেমনি মানবজাতির ইতিহাসে স্বাধীন বাঙালি জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। যে মর্যাদার জন্য বাঙালি হাজার বছর ধরে সংগ্রাম করেও সফল হয়নি। তাই ইতিহাস কয়, 'মুজিব যখন ধরলো হাল, পালটে গেল সর্বকাল'। এ কারণেই তাঁকে বলা হয় সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা। এটি আওয়ামী লীগের স্লোগান নয়। নয় জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো গল্প। এটাই ইতিহাস। কেউ বুদ্ধি করে ইতিহাস বানাতে পারে না। মানুষের কর্মে ইতিহাস সৃষ্টি হয়। কেউ মানুক আর না-ই মানুক, সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশই এখন বাঙালি জাতির প্রতীক। যতদিন যাবে, বিশ্বের সব প্রান্তের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের ঠিকানা হবে বাংলাদেশ। কারণ, ছোটো হলেও বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মানুষের একটিই ভাষা, একটিই দেশ। সুতরাং কোনো কালে, কোনো কারণেই ভাষাগত দিক থেকে রূপান্তরিত হওয়ার কোনো সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই। তাই আগামী দিনে বাংলাদেশই বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্ব করবে। এই জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতিসংঘের অধীনে বিশ্বের ১৯৫টি দেশে পালন করা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এই মহাযজ্ঞ। বিরোধীরা মানুষকে বোঝাতে চায়, আওয়ামী লীগ শুধু এ মানুষটিকে বড়ো করে দেখে তাদের দলীয় স্বার্থে। এ কথা জিয়াউর রহমানের জমানা থেকে শুনে আসছি। বঙ্গবন্ধুবিরোধী অপপ্রচার এদেশের মানুষকে নানা মুখরোচক গল্পে শোনানো হয়েছে। পুস্তক রচনা করে শেখানো হয়েছে। এখনো তারেক রহমানের মতো অনেকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কুটূক্তি করে। প্রশ্ন হচ্ছে– তারেক কেন এই বেয়াদবিটা করে। এর সহজ উত্তর– 'প্রতিহিংসা'। কিন্তু গোটা পৃথিবীর মানুষের মনে তো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রতিহিংসা নেই। তাই তারা বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া এই ক্ষণজন্মা মানুষটিকে সম্মান করে। তাদের মূল্যায়নে বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের নয়, তিনি গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে এক কিংবদন্তি, অনুশীলনীয় আদর্শ। আর এ কারণেই ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বের ১৯৫টি দেশে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে 'মুজিব জন্মশতবর্ষ'। বীর বাঙালির অর্জন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। বাংলা ভাষা এখন ব্রিটিশদের ঐতিহ্যবাহী লন্ডনের দ্বিতীয় কথ্য ভাষা।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হতো। সেসময় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কোনো উপায় ছিল না। পাকিস্তানি বাহিনী গোটা দেশকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। বঙ্গবন্ধু দিশেহারা হয়ে ছুটছিলেন– কীভাবে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায়, দেশটাকে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ দেওয়া হয়নি। ১৯৭৫ সালে ইতিহাসের নজিরবিহীন বর্বরতায় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এরপর কুড়ি বছরের বেশি সময় গেছে দেশটাকে লুটেপুটে খাওয়ার মহোৎসবে। '৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে সরকার গঠন করলে নতুন যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু পাঁচ বছর পর আবার ব্যাঘাত ঘটে। ২০০১ সালে আবার লুটের রাজ্যে পরিণত হয় বাংলাদেশ। এর পরে ওয়ান-ইলেভেনের অধীনে ২০০৮ সালে আবার আওয়ামী লীগ মহাজোট করে ক্ষমতায় আসে। বলা যায়, এখান থেকেই শুরু। ২০০৮ থেকে ২০২০ সাল– এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ আজ কোথায় চলে গেছে, দেশের বাইরে না গেলে কারও পক্ষেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বিশ্বের এমন কোনো দেশ বা জাতি নেই যারা আজ বাংলাদেশকে জানে না, চেনে না। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক্রমাগত উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে। এই সময়ে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বে নজিরবিহীন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে বলেই বিশ্বে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও উন্নয়নসহ বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উপমহাদেশ তথা বিশ্বের উন্নত অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের জীবন তো বায়বীয় কিছু না। অথবা শুধু স্বপ্ন নয়। যদি তর্কের খাতিরে বাংলাদেশকে এখনো গরিব দেশ হিসেবে ধরে নিই, তাহলে মূল্যায়ন করা দরকার কতটা গরিব? বাংলাদেশে কী নেই, বাঙালিরা কী পায় না, কী খায় না বা কী পরে না। বাংলাদেশের মানুষের কেন সাধ-আহ্লাদটি অপূর্ণ। এসব বিষয়ের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার আগে যে দেশের মানুষ একবেলা খাবারের জন্য অমানুষিক শ্রম বিক্রি করত, সে দেশের মানুষ আজ স্বল্প বা সামান্য মূল্যে খাদ্য পায়। ১৭ কোটি মানুষের এই বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা একটি বিস্ময়কর বিষয়। শুধু অর্জনেই নয়, বণ্টনেও বাংলাদেশ একটি মাইলফলক। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ আজ খাদ্যশস্য ছাড়াও মৎস্য ও পশুসম্পদের ক্ষেত্রেও ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। বর্তমানে সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক

অঞ্চল গড়ে তোলার মহাযজ্ঞ চলছে। এক্ষেত্রে দেড় লাখ কোটি টাকা বিদেশি বিনিয়োগ হতে যাচ্ছে। এই ১০০টি অঞ্চলের মধ্যে ইতোমধ্যে ৮৮টির স্থান চূড়ান্ত করে এক লাখ একরের বেশি পরিমাণ জমি নির্ধারণ করা হয়েছে। জমি নিয়েছে চীন, ভারত, জাপান, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুরের বড়ো বড়ো বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি। পাশাপাশি দেশের বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোও রয়েছে।

বিদ্যুতের জাদুর ছোঁয়ায় চাঙা হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি। বর্তমানে দেশের ৯৫ ভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ এখন ফেরি করে বিক্রি হয়। দেশে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭২ বছরে উন্নীত হয়েছে। নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে সফল। শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসের দিক থেকেও বাংলাদেশ এশিয়ায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন গোটা বিশ্বে ঈর্ষণীয় অবস্থানে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ রোল মডেল। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। মাথাপিছু আয় বর্তমানে প্রায় ২ হাজার ডলার। রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে।

সাধারণভাবে মানুষের জীবনমান বৃদ্ধি পেয়েছে। অবকাঠামোগত দিক থেকে পরিবর্তন ও উন্নয়ন দৃশ্যমান। পদ্মা সেতু, ফ্লাইওভার, মেট্রো রেল, দূরপাল্লার সব রাস্তা ফোর লেন, সাগরতলে ট্যানেল, ২০২২ সালে দৃশ্যমান হবে 'ওয়ান সিটি টু টাউন'– বাংলাদেশ এখন সত্যিকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে এক নম্বরে। প্রতিদিন মোবাইল ফোনে লেনদেন হচ্ছে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে ১০০ ভাগেরও বেশি হারে। দেশের প্রায় ১৫ কোটির বেশি মোবাইল সিম চালু রয়েছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ শিক্ষাদীক্ষা ও বৈদেশিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। এসব কারণে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে আজ বিশ্বের বড়ো বড়ো বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে। তারা বাংলাদেশকে নতুন করে মূল্যায়ন করছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ এই করোনা মহামারির সময়ও বাংলাদেশ বিস্ময়করভাবে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে। দুর্বল স্বাস্থ্য পরিষেবা থাকার পরও করোনায় বাংলাদেশে মৃত্যুহার কম। প্রথমদিকে ধারণা করা হয়েছিল, বাংলাদেশে যত লোক করোনায় মরবে, তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে এর উলটো। বাংলাদেশে একজন লোকও করোনার কারণে না খেয়ে মারা যায়নি। ১৭ কোটি মানুষের দেশে সরকার লকডাউনের সময় প্রায় ৮ কোটি মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে। এখনো দিয়ে যাচ্ছে। করোনার সময়ে আরেক বিপদ গেছে আম্পানের। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক। সেটাও সামলে নিয়েছে সরকার। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পখাতকে সচল রাখতে ৭২ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা সহায়তা দিচ্ছে। সরকারের সঠিক পরিকল্পনা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতির চাকা আবার ঘুরতে শুরু করেছে। আর এসব সম্ভব হচ্ছে জাতির পিতার সারাজীবনের লড়াই-সংগ্রামের ফসল বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের এই মহাযজ্ঞে গোটা জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আজকের বাস্তবতায় বাংলাদেশের বিপথগামী রাজনীতিকদের সঠিক পথে ফিরে আসারও এটাই সুযোগ। এই সুযোগকে কাজে লাগানো দরকার। বঙ্গবন্ধু এখন আর শুধু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা নন, তিনি বাঙালির নেতা, বিশ্বনেতা, জাতির পিতা। তাঁকে ছোটো করে দেখার হীনম্মন্যতায় ভুগলে নিজেদের অস্তিত্বই থাকে না। কারণ, বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশকে কল্পনাও করা যায় না। করলেও লাভ নেই। কেয়ামতের আগেও আরেকটি বাংলাদেশ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং বঙ্গবন্ধুর এই বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে আরও বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। জাতিসত্তাকে কেউ কোনো দিন অস্তিত্বহীন করতে পারে না। বাংলাদেশ মানেই স্বাধীন-সার্বভৌম বাঙালি জাতিসত্তার প্রতীক– হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

**লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, বিএফইউজে সভাপতি**

**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

**যোগাযোগ**
**প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ**
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
**৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা**

# অসমাপ্ত আত্মজীবনীর রেণু

ইয়াদিয়া জামান

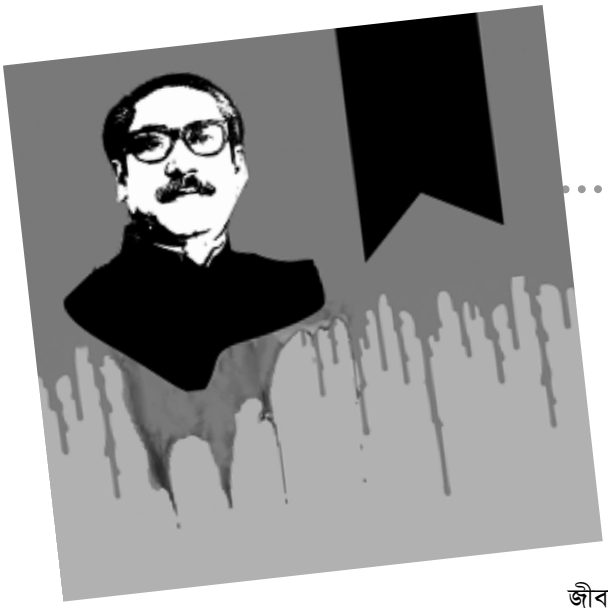

উজাড় হওয়া বাগানগুলোয়
ফুল ফুটতে থাকে–
পিপাসার্ত আকাশ
মেঘ ছুঁয়ে যায়,
ক্ষণিকের জন্যে
পৃথিবী থমকে দাঁড়ায়
মুহূর্তের জন্যে যেন
পাথরও হেসে ওঠে।
বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমানের
জীবনের ক্যানভাস আকাশের

মতো বিশাল। এই আকাশ অনেক রঙে বর্ণিল। টুঙ্গিপাড়া থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর– এই সময়সীমায় বাঙালি নামক একটি প্রাচীন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে পৃথিবীর মানচিত্রে তিনি জন্ম দিয়েছেন একটি নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। শত শত বছর বিদেশি শক্তি দ্বারা নিপীড়িত, শাসিত বাঙালির মধ্যে সংগত কারণেই তৈরি হয়েছে সুবিধাবাদী শ্রেণি, কমেছে জাতির নিজস্ব আত্মবিশ্বাস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি জাতিরাষ্ট্র জন্ম-যন্ত্রণায় যেমন লড়াই করতে হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে, তেমনই লড়তে হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের পা-চাটা সুবিধাবাদী বাঙালি গোষ্ঠীর সঙ্গেও। ঘরে ও বাইরের দুঃসহ এই লড়াইয়ে কেমন ছিল তাঁর ব্যক্তিগত পিপাসার্ত আকাশ? কী রঙে, কী ঢঙে ছুঁয়েছিল তাঁকে তাঁর মিষ্টি মেঘ? যদিও এ বিষয়ে তিনি কখনোই উচ্চকিত নন, তবে এর কিছু খণ্ডচিত্র আমরা পাই তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী তিনি শুরু করেছেন এভাবে– 'আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে এসে বলল, বসেই তো আছ, লেখো তোমার জীবনের কাহিনী।' উত্তরে তিনি বললেন, 'লিখতে যে পারি না; আর এমন কী করেছি যা লেখা যায়! আমার জীবনের ঘটনাগুলো জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।' জনগণ, তাদের জন্য কিছু

করতে পারা আর আদর্শের জন্য ত্যাগ– এই মূলমন্ত্র নিয়েই শুরু হয় লেখা। তিনি লেখেন, 'আমার স্ত্রী যার ডাকনাম রেণু– আমাকে কয়েকটা খাতা কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কয়টা আমাকে দিয়েছেন। রেণু আরও একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম।' এই লেখা শুরু হয় সম্ভবত ১৯৬৭ সালের ২য় অর্ধে রেণুর অনুপ্রেরণায়। তাঁর সহধর্মিণী, আত্মজীবনীর রেণু ব্যক্তি নারীর প্রয়োজনসমূহ অবদমিত করে আত্মস্থ করে নেন বঙ্গবন্ধুর জীবনের মূলমন্ত্র।

এই বইয়ে আমরা পাই– "একটি ঘটনা লেখা দরকার, নিশ্চয়ই অনেকে আশ্চর্য হবেন। আমার যখন বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স বারো-তেরো বছর হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাবার পরে ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, 'তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনীর বিবাহ দিতে হবে। কারণ, আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই বোনকে লিখে দিয়ে যাব।' রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। মুরুব্বির হুকুম মানার জন্যই রেণুর সঙ্গে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হলো। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না, রেণুর বয়স তখন বোধহয় তিন বছর হবে। রেণুর যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন তার মা মারা যান। একমাত্র রইল তার দাদা। দাদাও রেণুর সাত বছর বয়সে মারা যান। তারপর, সে আমার মা'র কাছে চলে আসে। আমার ভাইবোনদের সঙ্গেই রেণু বড় হয়। রেণুর বড় বোনের সঙ্গে আমার আর এক চাচাতো ভাইয়ের বিবাহ হয়। এরা আমার শ্বশুরবাড়িতে থাকল, কারণ আমার ও রেণুর বাড়ির দরকার নাই। রেণুদের ঘর আমাদের ঘর পাশাপাশি ছিল, মধ্যে মাত্র দুই হাত ব্যবধান। অন্যান্য ঘটনা আমার জীবনের ঘটনার মধ্যেই পাওয়া যাবে।"

> বঙ্গবন্ধুর অর্থের প্রয়োজন মেটাতে সব সময় তৈরি থাকা অন্নপূর্ণা রেণুকে নিয়ে তিনি লেখেন– আব্বা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। ... আমার দ্বারা তো কোনো আর্থিক সাহায্য পাবার আশা নাই। তোমাকেই চালাতে হবে

"রেণু কয়েকদিন আমাকে খুব সেবা করল। যদিও আমাদের বিবাহ হয়েছে ছোটবেলায়। ১৯৪২ সালে আমাদের ফুলশয্যা হয়। জ্বর একটু ভালো হলো। কলকাতা যাব, পরীক্ষাও নিকটবর্তী। লেখাপড়া তো মোটেই করি না। দিনরাত রিলিফের কাজ করে কূল পাই না। আব্বা আমাকে এ সময় একটা কথা বলেছিলেন, 'বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছ– এ তো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রেখ, 'sincerity of purpose and honesty of purpose' থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না।' একথা কোনো দিন আমি ভুলি নাই।"

বঙ্গবন্ধু আরও লেখেন, 'আব্বা ছাড়াও মায়ের কাছ থেকেও আমি টাকা নিতে পারতাম। আর সময় সময় রেণুও আমাকে কিছু টাকা দিতে পারত। রেণু যা কিছু জোগাড় করত বাড়ি গেলে এবং দরকার হলে আমাকেই দিত। কোনো দিন আপত্তি করে নাই, নিজে মোটেই খরচ করত না। গ্রামের বাড়িতে থাকত, আমার জন্যই রাখত।' আজমীর শরিফ ও আগ্রা থেকে ফেরার সময় বঙ্গবন্ধু কপর্দকশূন্য, সুটকেসের সঙ্গে জামাকাপড়ও হারিয়েছেন। এই সময় নিয়ে তিনি লিখেছেন– 'এরপর ভাবলাম কিছুদিন লেখাপড়া করব। কাপড় জামাও নতুন করে বানাতে হবে। প্রায় সকল কাপড়ই চুরি হয়ে গেছে। বাড়িতে এসে রেণুর কাছে আমার অবস্থা প্রথমে জানালাম। দিল্লি ও আগ্রা থেকে রেণুকে চিঠিও দিয়েছিলাম। আব্বাকে বলতেই হবে। আব্বাকে বললে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন মনে হলো। কিছুই বললেন না। পরে বলেছিলেন, বিদেশ যখন যাও বেশি কাপড় নেওয়া উচিত নয় এবং সাবধানে থাকতে হয়।'

"আব্বা, মা, ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেণুর ঘরে এলাম বিদায় নিতে। দেখি কিছু টাকা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। 'অমঙ্গল অশ্রুজল' বোধহয় অনেক কষ্টে বন্ধ করে রেখেছে। বলল, 'একবার কলকাতা গেলে আর আসতে চাও না। এবার কলেজ ছুটি হলেই বাড়ি এসো।' টাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা রেণু, অমঙ্গল অশ্রুজল কষ্টে লুকিয়ে রাখা রেণুর আকুতি, এবার কলেজ ছুটি হলেই বাড়ি এসো।" অসাধারণ প্রেমময় মুহূর্ত। শুধু এই একটি দৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হতে পারে পৃথিবীর সেরা একটি চলচ্চিত্র। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছ থেকে সেই চলচ্চিত্র অবশ্যই আমরা পাব। বিএ পরীক্ষা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। রেণুর বিশ্বাস– তিনি পাশে থাকলে তাঁর প্রিয় পুরুষটি পরীক্ষায় পাস করবেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন– 'পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় চলে আসি। হোস্টেল ছেড়ে দিয়েছি। আমার ছোট বোনের স্বামী বরিশালের অ্যাডভোকেট আবদুর রব সেরনিয়াবাত তখন পার্ক সার্কাসে একটা বাসা ভাড়া নিয়েছেন। আমার বোনও থাকত, তার কাছেই উঠলাম। কিছুদিন পরে রেণুও কলকাতায় এসে হাজির। রেণুর ধারণা, পরীক্ষার সময় সে আমার কাছে থাকলে আমি নিশ্চয় পাস করব। বিএ পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম।'

ঢাকা জেলের কথা মনে করতে গিয়ে লিখছেন– 'একদিন আমার হাতের কব্জি সরে গিয়েছিল, পড়ে গিয়ে। ভীষণ যন্ত্রণা, সহ্য করা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। আমাকে বোধহয় মেডিকেল কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছিল। একজন নতুন ডাক্তার ছিল জেলে। আমার হাতটা ঠিকমতো বসিয়ে দিল। ব্যথা সাথে সাথে কম হয়ে গেল। আর যাওয়া লাগল না। বাড়িতে আমার আব্বা ও মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। রেণু তখন হাসিনাকে নিয়ে বাড়িতেই থাকে। হাসিনা তখন একটু হাঁটতে শিখেছে। রেণুর চিঠি জেলেই পেয়েছিলাম। কিছু টাকাও আব্বা পাঠিয়েছিলেন। রেণু জানত, আমি সিগারেট খাই। টাকা-পয়সা নাও থাকতে পারে। টাকার দরকার হলে লিখতে বলেছিল।' প্রিয় পুরুষটির রাজনীতি আর সমাজসেবা ছাড়া অন্য কোনোদিকে মন নেই। উপার্জনহীন পিতার অর্থের ওপর নির্ভরশীল এমন প্রাণপুরুষটির সিগারেটের টাকার দরকার হলে লিখতে বলেছিল রেণু। পিতার কাছ থেকে সিগারেটের টাকা নিতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে রেণুর।

নিজের প্রয়োজন জলাঞ্জলি দিয়ে টাকা জমায়, টাকা পাঠায় প্রিয় পুরুষের শখ পূরণে।

যে পাকিস্তানের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তার উলটো যাত্রার পর তিনি লেখেন– "স্বাধীন হয়েছে দেশ, তবু মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হয় না কেন? দুর্নীতি বেড়ে গেছে, খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। বিনা বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের জেলে বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মুসলিম লীগ নেতারা মানবে না। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পকারখানা গড়া শুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। রাজধানী করাচি। সবকিছুই পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব বাংলায় কিছু নাই। আব্বাকে সকল কিছুই বললাম। আব্বা বললেন, 'আমাদের জন্য কিছু করতে হবে না। তুমি বিবাহ করেছ, তোমার মেয়ে হয়েছে, তাদের জন্য তো কিছু একটা করা দরকার।' আমি আব্বাকে বললাম, 'আপনি তো আমাদের জন্য জমিজমা যথেষ্ট করেছেন, যদি কিছু না করতে পারি, বাড়ি চলে আসব। তবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে না।' আমাকে আর কিছুই বললেন না। রেণু বলল, 'এভাবে তোমার কতকাল চলবে।' আমি বুঝতে পারলাম, যখন আমি ওর কাছে এলাম। রেণু আড়াল থেকে সব কথা শুনেছিল। রেণু খুব কষ্ট করত, কিন্তু কিছুই বলত না। নিজে কষ্ট করে আমার জন্যে টাকা-পয়সা জোগাড় করে রাখত যাতে আমার কষ্ট না হয়।

আমি ঢাকায় রওনা হয়ে আসলাম। রেণুর শরীর খুব খারাপ দেখে এসেছিলাম। ইত্তেহাদের কাজটা আমার ছিল। মাঝে মাঝে কিছু টাকা পেতাম, যদিও দৈনিক ইত্তেহাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। পূর্ব বাংলা সরকার প্রায়ই ব্যান্ড করে দিত। এজেন্টরা টাকা দেয় না। পূর্ব বাংলায় কাগজ যদিও বেশি চলত।"

গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে খুঁজছে, গ্রেফতারের সব আয়োজন সম্পন্ন জেনেও গ্রেফতারের আগে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে চান। বেনাপোলে নেমে চেষ্টা করেন পুলিশের চোখ ফাঁকি দেওয়ার। এই সময় তিনি লেখেন– 'ফাঁকি আমাকে দিতেই হবে, সেই জন্য আমার আরও বেশি ব্যথা লাগে। মন চলে গেছে বাড়িতে। কয়েক মাস পূর্বে আমার বড় ছেলে কামালের জন্ম হয়েছে, ভালো করে দেখতেও পারি নাই ওকে। হাসিনা তো আমাকে পেলে ছাড়তেই চায় না। অনুভব করতে লাগলাম যে, আমি ছেলে-মেয়ের পিতা হয়েছি। আমার আব্বা ও মাকে দেখতে মন চাইছে। তাঁরা জানেন; লাহোর থেকে ফিরে নিশ্চয়ই একবার বাড়িতে আসব। রেণু তো নিশ্চয়ই পথ চেয়ে বসে আছে। সে তো নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু কিছু বলে না। কিছু বলে না বা বলতে চায় না, সেই জন্য আমার আরও বেশি ব্যথা লাগে।'

প্রেমিক বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় নারীর প্রতি অনুভূতির উচ্চকিত প্রকাশ এড়িয়েই গিয়েছেন; কিন্তু দয়িতার দহন তিনি তীব্রভাবেই অনুভব করেছেন, কষ্ট পেয়েছেন। এই কষ্ট লাঘবের সময় কাছে ছিল না বলে তাঁর কষ্ট তীব্রতর হলেও বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের স্বার্থে এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকা একান্ত ব্যক্তিগত না পাওয়ার অক্ষমতা একে অপরের কাছে গোপন করেছেন সারাজীবন। তিনি লেখেন– "রেণু বলল, 'কতদিন দেখা হবে না বলতে পারি না। আমিও তোমার সাথে বড়বোনের বাড়িতে যাব, সেখানেও তো দু-একদিন থাকবা। আমি ও ছেলেমেয়ে দুইটা তোমার সাথে থাকব। পরে আব্বা গিয়ে আমাকে নিয়ে আসবেন।' আমি রাজি হলাম, কারণ আমি তো জানি, এবার আমাকে বন্দি করলে সহজে ছাড়বে না।"

বঙ্গবন্ধুর অর্থের প্রয়োজন মেটাতে সব সময় তৈরি থাকা অন্নপূর্ণা রেণুকে নিয়ে তিনি লেখেন– "আব্বা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। আর রেণুও কিছু টাকা নিয়ে এসেছিল আমাকে দিতে। আমি রেণুকে বললাম, 'এতদিন একলা ছিলে, এখন আরও দুইজন তোমার দলে বেড়েছে। আমার দ্বারা তো কোনো আর্থিক সাহায্য পাবার আশা নাই। তোমাকেই চালাতে হবে। আব্বার কাছে তো সকল সময় তুমি চাইতে পার না, সে আমি জানি। আর আব্বাই বা কোথায় এত টাকা পাবেন? আমার টাকার বেশি দরকার নাই। শীঘ্রই গ্রেফতার করে ফেলবে। পালিয়ে বেড়াতে আমি পারব না। তোমাদের সাথে কবে আর দেখা হবে ঠিক নাই। ঢাকা এসো না। ছেলেমেয়েদের কষ্ট হবে। মেজো বোনের বাসায়ও জায়গা খুব কম। কোনো আত্মীয়দের আমার জন্য কষ্ট হয়, তা আমি চাই না। চিঠি লিখ, আমিও লিখব।' রেণু আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় নীরবে চোখের পানি ফেলছিল। আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম না, একটা চুমো দিয়ে বিদায় নিলাম। বলবার তো কিছুই আমার ছিল না। সবই তো ওকে বলেছি।"

বিদায়ের সময় রেণু নীরবে চোখের পানি ফেলছেন– প্রেমিক বঙ্গবন্ধু, স্বামী বঙ্গবন্ধু কোনো সান্ত্বনা বা আশার বাণী শোনাতে পারছেন না, তাঁর এই অসহায়ত্ব তিনি প্রকাশ করেছেন শুধু প্রেমময় একটি চুম্বন দিয়ে। 'সবই তো ওকে বলেছি'– এই আকুতি, এই নিবেদন, প্রিয় নারীর কাছে আত্মসমর্পণের এই চিত্র মহানায়ককে প্রেমিক হিসেবে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। এ প্রেমিকের নিজস্ব নারীটি সময়ের পরিক্রমায় বড়ো বেশি দায়িত্ববান হয়ে উঠেন মা হিসেবে, রাজনৈতিক সহকর্মী হিসেবে। রেণুর সংসার বড়ো হচ্ছে। গ্রেফতার বঙ্গবন্ধুর বিচারকাজ চলছে। বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে, রেণুর উদ্বেগে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু লেখেন– "বুকে ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেছি। রেণু আমাকে সাবধান করল এবং বলল, 'ভুলে যেও না তুমি হার্টের অসুখে ভুগেছিলে এবং চক্ষু অপারেশন হয়েছিল।' ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আর কী করা যায়। হাসু আমাকে মোটেই ছাড়তে চায় না। আজকাল বিদায় নেওয়ার সময় কাঁদতে শুরু করে। কামালও আমার কাছে এখন আসে। হাসু 'আব্বা' বলে দেখে কামালও 'আব্বা' বলতে শুরু করেছে। গোপালগঞ্জ থানা এলাকার মধ্যে থাকতে পারি বলে কয়েক ঘণ্টা ওদের সাথে থাকতে সুযোগ পেতাম।"

"রেণু আমাকে যখন একাকী পেল, বলল, 'জেলে থাক আপত্তি নাই, তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখ। তোমাকে দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমার বোঝা উচিত আমার দুনিয়ায় কেউই নাই। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেছেন, আমার কেউ নাই। তোমার কিছু হলে বাঁচব কী করে?' কেঁদেই ফেলল। আমি রেণুকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, তাতে ফল হলো উল্টো। আরও কাঁদতে শুরু করল, হাসু ও কামাল ওদের মা'র কাঁদা দেখে ছুটে গিয়ে গলা ধরে আদর করতে লাগল। আমি বললাম, 'খোদা যা করে তাই হবে, চিন্তা করে লাভ কী?' পরের দিন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মাকে বোঝাতে অনেক কষ্ট হলো।"

আওয়ামী লীগের কমিটি গঠনের কাজ চলছে। বঙ্গবন্ধু সব জেলায় ঘুরে সংগঠনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। এই সময় তিনি লেখেন– 'ল পড়া ছেড়ে দিয়েছি। আব্বা খুবই অসন্তুষ্ট, টাকা-পয়সা দিতে চান না। আমার কিছু একটা করা দরকার। ছেলেমেয়ে হয়েছে, এভাবে কতদিন চলবে! রেণু কিছুই বলে না, নীরবে কষ্ট সহ্য করে চলেছে।

আমি বাড়ি গেলেই কিছু টাকা লাগবে তাই জোগাড় করার চেষ্টায় থাকত। শেষ পর্যন্ত আব্বা আমাকে টাকা দিলেন, খুব বেশি টাকা দিতে পারেন নাই, তবে আমার চলবার মতো টাকা দিতে কোনো দিন আপত্তি করেন নাই। আমার নিজের বেশি কোনো খরচ ছিল না, একমাত্র সিগারেটই বাজে খরচ বলা যেতে পারে। আমার ছোট ভাই নাসের ব্যবসা শুরু করেছে খুলনায়। সে আমার ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করে। বাড়ি থেকে তার কোনো টাকা-পয়সা নিতে হয় না। লেখাপড়া

ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু টাকা বাড়িতে দিতেও শুরু করেছে।'

রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হচ্ছে দ্রুত। যুক্তফ্রন্ট এই পটপরিবর্তনে হক সাহেবের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করবে– এই সময় বঙ্গবন্ধু লেখেন, "আমি সন্ধ্যার দিকে ঢাকায় ফিরে এলাম। বাসায় যেয়ে দেখি রেণু ছেলেমেয়ে নিয়ে গতকাল ঢাকায় এসেছে। সে এখন ঢাকায়ই থাকবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। আমি খুশিই হলাম, আমি তো মোসাফিরের মতো থাকি। সে এসে সকল কিছু ঠিকঠাক করতে শুরু করেছে। আমার অবস্থা জানে, তাই বাড়ি থেকে কিছু টাকাও নিয়ে এসেছে। আমি হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, 'তোকে মন্ত্রী হতে হবে। আমি তোকে চাই, তুই রাগ করে 'না' বলিস না। তোরা সকলে বসে ঠিক কর, কাকে কাকে নেয়া যেতে পারে।' আমি তাঁকে বললাম, 'আমাদের তো আপত্তি নাই।"

মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তিনি লেখেন, 'রাত চার ঘটিকায় বাড়িতে পৌঁছলাম। শপথ নেওয়ার পর পাঁচ মিনিটের জন্য বাড়িতে আসতে পারি নাই। আর দিনভর কিছু পেটেও পড়ে নাই। দেখি রেণু চুপটি করে না খেয়ে বসে আছে, আমার জন্য।'

মাত্র কয়েক দিন পরের ঘটনা, আমরা আত্মজীবনীতে দেখি– "বাসায় এসে দেখলাম, রেণু এখনো ভালো করে সংসার পাততে পারে নাই। তাকে বললাম, 'আর বোধহয় দরকার হবে না। কারণ মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবে, আর আমাকেও গ্রেফতার করবে। ঢাকায় কোথায় থাকবা, বোধহয় বাড়িই চলে যেতে হবে। আমার কাছে থাকবা বলে এসেছিলা, ঢাকায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ হবে, তা বোধহয় হলো না। নিজের হাতের টাকা-পয়সাগুলোও খরচ করে ফেলেছ।' রেণু ভাবতে লাগল, আমি গোসল করে ভাত খেয়ে একটু বিশ্রাম করছিলাম। বেলা তিনটায় টেলিফোন এলো, কেন্দ্রীয় সরকার ৯২(ক) ধারা জারি করেছে। মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা হয়েছে। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর, আর এনএম খানকে চিফ সেক্রেটারি করা হয়েছে।"

এরপর তিনি আরও লেখেন– "আমি রেণুকে বললাম, 'আবার আসলে বলে দিও শীঘ্র আমি বাড়িতে পৌঁছাব।' বিদায় নেওয়ার সময় অনেককে বললাম, 'আমি তো জেলে চললাম, তবে একটা কথা বলে যাই, আপনারা এই অন্যায় আদেশ নীরবে মাথা পেতে মেনে নেবেন না। প্রকাশ্যে এর বাধা দেওয়া উচিত। দেশবাসী প্রস্তুত আছে, শুধু নেতৃত্ব দিতে হবে আপনাদের। জেলে অনেকের যেতে হবে, তবে প্রতিবাদ করে জেল খাটাই উচিত।' সেখান থেকে এসে পথে কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করলাম, কাউকেও পাওয়া গেল না। আমি সরকারি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা ভাড়া করে বাড়ির দিকে রওনা করলাম। দেখলাম, কিছু কিছু পুলিশ কর্মচারী আমার বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। আমি রিকশায় পৌঁছালাম, তারা বুঝতে পারে নাই। রেণু আমাকে খেতে বলল, খাবার খেয়ে কাপড় বিছানা প্রস্তুত করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এহিয়া খান চৌধুরীকে ফোন করে বললাম, 'আমার বাড়িতে পুলিশ এসেছিল, বোধহয় আমাকে গ্রেফতার করার জন্য। আমি এখন ঘরেই আছি গাড়ি পাঠিয়ে দেন।' তিনি বললেন, 'আমরা তো হুকুমের চাকর। গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকুন। আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য বারবার টেলিফোন আসছে।' আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম। রেণু আমার সকল কিছু ঠিক করে দিল এবং কাঁদতে লাগল। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের ওঠাতে নিষেধ করলাম। রেণুকে বললাম, 'তোমাকে কী বলে যাব, যা ভালো বোঝ কর, তবে ঢাকায় থাকলে কষ্ট হবে, তার চেয়ে বাড়ি চলে যাও। বিনা দ্বিধায় বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দিচ্ছেন মন্ত্রিত্ব এর জন্য কোনো আক্ষেপ নেই রেণুর, বরং জেলে যাওয়ার বিছানা গুছিয়ে দিচ্ছেন পরম মমতায়।"

'রেণু টেলিগ্রাম পেয়েছে। আব্বার শরীর খুবই খারাপ, তাঁর বাঁচবার আশা কম। ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে রওনা করবে আব্বাকে দেখতে। একটা দরখাস্তও করেছে সরকারের কাছে, টেলিগ্রামটা সঙ্গে দিয়ে। তখন জনাব এনএম খান চিফ সেক্রেটারি ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তান হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। রাত আট ঘটিকার সময় আমার মুক্তির আদেশ দিলেন।' এর পরের ঘটনায় তিনি লেখেন– "আমি জেলগেট পার হয়ে দেখলাম, রায়সাহেব বাজারে আমাদের কর্মী নুরুদ্দিন দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বলল, 'ভাবি এই মাত্র বাড়িতে রওনা হয়ে গেছে, আপনার আব্বার শরীর খুবই খারাপ। তিনি বাদামতলী ঘাট থেকে জাহাজে উঠেছেন। জাহাজ রাত ১১টায় নারায়ণগঞ্জ পৌঁছবে। এখনো সময় আছে, তাড়াতাড়ি রওনা করলে নারায়ণগঞ্জে যেয়ে জাহাজ ধরতে পারবেন।' তাকে নিয়ে ঢাকার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। কারণ, পূর্বে এ বাড়ি আমি দেখি নাই। আমি জেলে আসার পরে রেণু এটা ভাড়া নিয়েছিল। মালপত্র কিছু রেখে আর সামান্য কিছু নিয়ে নারায়ণগঞ্জ ছুটলাম। তখনকার দিনে ট্যাক্সি পাওয়া কষ্টকর ছিল। জাহাজ ছাড়ার পনেরো মিনিট পূর্বে আমি নারায়ণগঞ্জ ঘাটে পৌঁছলাম। আমাকে দেখে রেণু আশ্চর্য হয়ে গেল। বাচ্চারা ঘুমিয়েছিল। রেণু তাদের ঘুম থেকে তুলল। হাচিনা ও কামাল আমার গলা ধরল, অনেক সময় পর্যন্ত ছাড়ল না, ঘুমালেও না, মনে হচ্ছিল ওদের চোখে আজ আর ঘুম নেই।"

রেণু ঐশ্বরিক সহ্যশক্তি নিয়ে সোনার বাংলা সৃষ্টির জন্য-যন্ত্রণাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে হয়ে উঠেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহযোদ্ধা। জেলে থাকাবস্থায় আত্মজীবনীর ১৭১ পাতায় বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আমি একটা ফুলের বাগান করেছিলাম। আমার বাগানটা খুব সুন্দর হয়েছিল।' যে প্রেমিকের জীবন ঘিরে থাকে রেণু আর রেণুর প্রেম– কবি বলেন তাঁর উজাড় হওয়া বাগানেও হাওয়া ফুল ফোটায়।

**লেখক: সাবেক সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল**

# শেষের সেদিনে মুখোমুখি যারা

**জাফর ওয়াজেদ**

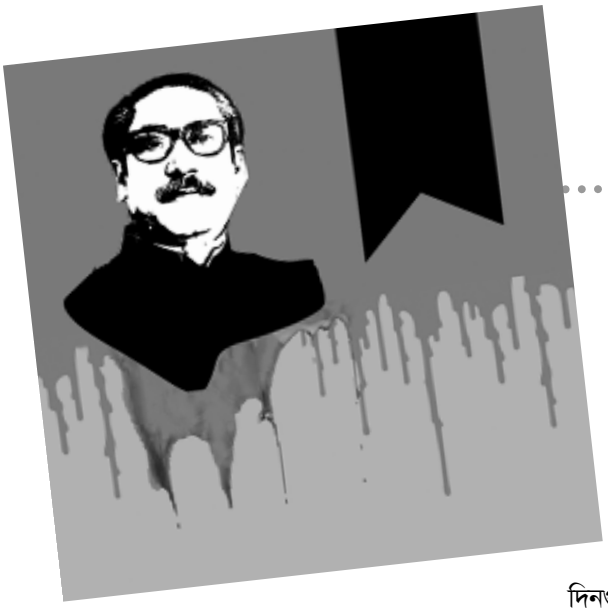

ছিলেন তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ। হিমালয়ের চেয়ে উঁচু যার ব্যক্তিত্ব ও সাহস। নিজ জাতিকেও করে তুলেছিলেন সাহসী যোদ্ধা। স্বাধীন দেশে ষড়যন্ত্রকারীরা শান্তিতে দেশ পরিচালনা করতে দেয়নি। কেমন কেটেছে শেষের দিনগুলো? রাষ্ট্রপতি হিসেবে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শেষের দিনগুলো কেমন ছিল? ঘাতকের নিশ্বাস কি তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন? 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস'; যিনি নিজেই জনসভায় আবৃত্তি করতেন, তিনি কি টের পাওয়ার সময়টুকু পেয়েছিলেন যে ঘাতকরা যে কোনো সময়, যে কোনো মুহূর্তেই আঘাত হানবে? বিশ্বাস তো ছিল তাঁর প্রখর যে, কোনো বাঙালি তাঁকে হত্যা দূরে থাক, আঘাত করার মতো মানসিকতা রাখে না। ভেবেছিলেন– 'সাড়ে সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করোনি'র বিপরীতে তাঁর বাঙালি মানুষে পরিণত হয়েছে; সুতরাং মনুষ্যবিবর্জিত কোনো কর্মকাণ্ড বাঙালি করবে– এ ছিল ভাবনার জগতে অস্পৃশ্য। অথচ বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। ঘাতকরা তখনও 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস' করে অস্ত্র শানিয়ে যাচ্ছে ষড়যন্ত্রের নানা ঘুঁটি পাকিয়ে। দেশজুড়ে নানা রকম অস্থিরতা, অরাজকতার যে ডালপালা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, তা নিরসনের পদক্ষেপগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল শান্তির পরিবেশ সৃষ্টির। আর এই সময়টাতে তিনি দ্রব্যমূল্যকে নিয়ে এসেছিলেন নিয়ন্ত্রণে। সবকিছু সুনসান হয়ে ওঠার মুহূর্তগুলো ধরা দিতে থাকে ক্রমশ।

শেষের দিনগুলোয় খুনিদের সহযোগী, পরামর্শকরাও দেখাসাক্ষাৎ করেছেন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। তারা কি ঘটনাপূর্ব 'রেকি' করছিলেন, নাকি সবটাই দাপ্তরিক কাজ ছিল– তা স্পষ্ট হয় পরবর্তী

ঘটনাপ্রবাহে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্য। এই হত্যা পরিস্থিতি সৃষ্টির নেপথ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিল দেশি-বিদেশি অনেক কুশীলব। সেসব ক্রমশ প্রকাশিত হয় এখনো। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে। কিন্তু হত্যার ষড়যন্ত্র আজও সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে অনুদ্ঘাটিত।

১৯৭৫ সালের ১ আগস্ট থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত দুই সপ্তাহের দিনগুলোয় রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু কাটিয়েছিলেন খুবই ব্যস্ত সময়। সরকারি কর্মসূচির বাইরেও গঠিত নতুন দল বাকশালের পূর্ণাঙ্গ 'সেট-আপ' তৈরিতেও ছিলেন ব্যস্ত। পাশাপাশি খুনিরাও ছিল অপতৎপরতায় শশব্যস্ত।

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের ১৪ দিনের সরকারি কর্মসূচির তালিকা পর্যালোচনা করলে বিস্ময় জাগে যে, শেষের সেই দিনগুলোয় ব্যস্ততার মাঝেও কেটেছে রাষ্ট্রনায়কের বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে। নেতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এমন লোকজন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও শেষ দিনগুলোয় তাঁকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দিয়েছে– এমনটা নয়। নানামুখী চাপ তাঁর স্কন্ধজুড়ে তখন।

বিস্ময় বাড়ে যে, বঙ্গবন্ধুর এই সময়ের সাক্ষাৎপ্রার্থী, যারা নেতার সান্নিধ্য পেতে ভিড় করেছিলেন, তাদের অনেককেই দেখা গেছে বঙ্গবন্ধুর শাহাদতের পর তাঁর খুনি ও শত্রুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ এবং হাতে হাত মেলাতে, দখলদার সরকারের মন্ত্রী হতে। ছিল যারা তাঁর পারিষদ। আরও বিস্ময় জাগায়, বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে যেসব দেশ বা তার রাষ্ট্রদূতরা নানাভাবে জড়িত, তা ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে এই একুশ শতকে এসেও। ফাঁস হচ্ছে ষড়যন্ত্রের নানাবিধ জাল। দেখা যায়, শেষের দিনগুলোয় তাদের কয়েকজন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, কথা বলেছেন। তারা রাষ্ট্রপতি মুজিবের মানসিক অবস্থা বুঝতে দেখা করেছিলেন সম্ভবত। অনুমান করা যায়, তাদের এই সাক্ষাৎ বঙ্গবন্ধুর ভেতরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে 'ঝোপ বুঝে কোপ মারার' মতোই ছিল হয়তো।

> বোস্টার জানতেন খুনিদের তৎপরতা। তিনি শেখ মুজিবকে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করেননি। বরং ঘটনার অনুচক্র হিসেবে তার ভূমিকা পরে প্রকাশিত হচ্ছে, হবে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার নেপথ্যে তার ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত

কর্মসূচি ছিল ১৫ আগস্ট সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধুর। এর একদিন আগে ১৩ আগস্ট রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছিলেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। ১৫ আগস্টের ১০ দিন আগে ৫ আগস্ট দেখা করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ই এ বোস্টার। সর্বশেষ সাক্ষাৎপ্রার্থী ছিলেন ১৪ আগস্ট সংসদ সদস্য অধ্যাপক আজরা আলী, যিনি ১৫ আগস্ট মোশতাকের পার্শ্বচর হয়ে যান। এমনকি খুনিদের পক্ষে সাফাই গেয়ে অন্য সংসদ সদস্যদের মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য চাপ প্রয়োগ করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মোশতাকের দল ডেমোক্রেটিক লীগও করেন। প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী নুরুল ইসলাম চৌধুরী সর্বাধিক সাক্ষাৎ করেছেন একা বা তিন বাহিনী প্রধানকে নিয়ে পৃথকভাবে।

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের দৈনন্দিন সরকারি কর্মসূচিতে নজর দিলে দেখা যায়, সাক্ষাৎপ্রার্থীরা সাক্ষাৎকালে বেশি সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন, তা নয়। ১৫ থেকে ২৫ মিনিট সময়কাল তারা অতিবাহিত করেন। স্বল্প সময়ে তারা কী হাসিল করেছে, তা স্পষ্ট হয় তাদের পরবর্তী কার্যক্রমে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কর্মরত অনেকেই পরে খুনিদের সঙ্গে হাতও মেলায়। সর্বশেষ দিন ১৪ আগস্টের তালিকা থেকে পেছনের দিকে গেলে ভেসে আসে অনেক নাম, যাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয় ১৫ আগস্টের পর।

১৪ আগস্টের তালিকায় দেখা যায় দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্ক চুং হির বিশেষ দূত সাক্ষাৎ করেন। সকাল ১০টায় নৌবাহিনী প্রধান দেখা করেন, যিনি ১৫ আগস্ট সকালে বেতারে গিয়ে মোশতাকের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেন অন্য বাহিনী প্রধানদের সঙ্গে। ওইদিন সকাল সাড়ে ১০টায় খুনিদের অন্যতম সহযোগী বেতার ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং বেলা ১১টায় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী চট্টগ্রামের পটিয়ার নুরুল ইসলাম চৌধুরী এবং বিমানবাহিনীর প্রধান এ কে খোন্দকার দেখা করেন। তাদের এই সাক্ষাতের ১৮ ঘণ্টা পর বঙ্গবন্ধু খুন হন। বিমানবাহিনী প্রধান ১৫ আগস্ট সকালে মোশতাকের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। প্রতিমন্ত্রী পরে মোশতাকের মন্ত্রী হন। বেলা সাড়ে ১১টায় দেখা করেন জাতীয় লীগ সভাপতি আতাউর রহমান খানের দুই কন্যা। এদের জামাতারা এবং সহোদররা পরে বিএনপিতে যোগ দেয়। বিকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বোস প্রফেসর ড. আবদুল মতিন চৌধুরী দেখা করে পরদিন সমাবর্তন আয়োজন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেন। সন্ধ্যা ৬টায় শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও শিক্ষা সচিব সাক্ষাৎ করেন। ড. মোজাফফর পরে জিয়ারও শিক্ষা উপদেষ্টা হয়েছিলেন। সর্বশেষ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সাক্ষাৎ করেন সংসদ সদস্য অধ্যাপক আজরা আলী এবং শ্রীমতি সুপ্রভা মাঝি। আজরা আলী মোশতাকের ডেমোক্রেটিক লীগের নেত্রী হয়েছিলেন। সুপ্রভা সম্পর্কে পরে কিছু জানা যায়নি। অনুমান করা যায়, আজরা আলী সেদিন বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে হয়তো এমন তথ্য নিয়েছেন, যা হত্যাকারীদের পরিকল্পনায় কাজে লেগেছে। ১৩ আগস্ট ছিল বুধবার। বেলা ১১টায় যুক্তরাষ্ট্রে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এমআর সিদ্দিকী বিদায়ি সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় চাঁদপুরের এমপি এমএ রব সাক্ষাৎ করেন।

মঙ্গলবার ১২ আগস্ট সকাল ১০টায় সাক্ষাৎ করেন অর্থমন্ত্রী ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, যিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী কর্নেল ফারুকুর রহমানের সম্পর্কে আপন খালু এবং মোশতাকের অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনদিন পর ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় শপথ নেন, যখন বঙ্গবন্ধুর লাশ সিঁড়িতে। সন্ধ্যা ৬টায় দেখা করেন সফররত কমনওয়েলথ সেক্রেটারি অধ্যাপক এএফ হোসেন, যিনি পাকিস্তানি।

শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী ১১ আগস্ট সোমবার বেলা ১১টায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাকশালের অঙ্গসংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীনতার

ঘোষণা পাঠকারী। এই সাক্ষাতের চারদিন পর তিনি মোশতাকের মন্ত্রী হন। পরে জিয়াউর রহমানেরও শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সাক্ষাৎ করেন কর্ম কমিশনের সদস্য আযহারুল ইসলাম।

রবিবার ১০ আগস্ট ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। পাকিস্তান জমানা থেকে এই ছুটি বহাল ছিল। এরশাদ যুগে রবিবার ছুটি বাতিল হয়। ৯ আগস্ট শনিবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি ড. স্যাম স্ট্রিট সকাল ১০টায় সাক্ষাৎ করেন আর বেলা ১১টায় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী নুরুল ইসলাম চৌধুরী ও সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যা ৬টায় বাকশালের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসহ অন্যরা সাক্ষাৎ করেন। এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর বাকশাল নেতাদের প্রতি শেষ ভাষণ। সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় অ্যাটর্নি জেনারেল দেখা করেন।

৮ আগস্ট ছিল শুক্রবার। সকাল ১০টায় প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানদ্বয় দেখা করেন। সকাল সাড়ে ১০টায় রেল প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ আলতাফ হোসেন এবং বেলা সাড়ে ১১টায় পানি ও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী মোমিনউদ্দিন আহমদ সাক্ষাৎ করেন। এরা দুজন পরে মোশতাকের মন্ত্রী হন। সৈয়দ আলতাফ ছিলেন ন্যাপ (মোজাফফর) নেতা।

৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় সুইজারল্যান্ডের নয়া রাষ্ট্রদূত পরিচয়পত্র পেশ করেন বঙ্গবন্ধুর কাছে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে 'প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে' রূপান্তর করার যে স্বপ্ন দেখেন, তা ব্যক্ত করেন। পরদিন সংবাদপত্রে তা ছাপা হয়। সকাল সাড়ে ১০টায় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী নুরুল ইসলাম চৌধুরী, ১১টায় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী দেওয়ান ফরিদ গাজী সাক্ষাৎ করেন। এরা দুজনে পরে মোশতাকের মন্ত্রী হন। দুপুর ১২টায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বিদেশ সফরের প্রাক্কালে সাক্ষাৎ করেন, যা ছিল শেষ সাক্ষাৎ। এই দিন বিকাল সাড়ে ৫টায় ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার সমর সেন সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকালে মিস্টার সেন সতর্ক করেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে নানা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বলে তাদের কাছে তথ্য ছিল। সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় কৃষক লীগ কেন্দ্রীয় সদস্য আবদুল আওয়াল এবং ৬টা ১০ মিনিটে কাজী মোজাম্মেল হক এমপি সাক্ষাৎ করেন।

৬ আগস্ট বুধবার দুপুর ১২টায় শ্রমমন্ত্রী জহুর আহমদ চৌধুরী এবং ১২টা ১০ মিনিটে সংস্কৃতি, তথ্য ও বেতারমন্ত্রী কোরবান আলী, প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং সচিব মতিউল ইসলাম দেখা করেন।

৫ আগস্ট মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সাক্ষাৎ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ই এ বোস্টার। বোস্টার জানতেন খুনিদের তৎপরতা। তিনি শেখ মুজিবকে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করেননি। বরং ঘটনার অনুচক্র হিসেবে তার ভূমিকা পরে প্রকাশিত হচ্ছে, হবে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার নেপথ্যে তার ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। সকাল সাড়ে ১০টায় সাক্ষাৎ করেন শিল্পমন্ত্রী। বিকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে সিলেটের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ইলিয়াস, কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী ও গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী সাক্ষাৎ করেন। এই তিন সংসদ সদস্যের কেউই মোশতাককে সমর্থন করেননি; না করায় মানিক চৌধুরীকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। এদিন সন্ধ্যা ৬টায় ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার শামসুর রহমান বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন এবং গাইডলাইন নেন। ২০ আগস্ট তিনি মোশতাক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সাক্ষাৎ করেন বেতারের ডিজি আশরাফুজ্জামান খান।

৪ আগস্ট সোমবার। সকাল ১০টায় দেখা করেন পাকিস্তানফেরত মেজর জেনারেল মাজেদুল হক। ঢাকায় আসার আগের দিনও পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরি করেছেন। ঢাকায় স্ক্রিনিং বোর্ড তাকে বাদ দেয়। কিন্তু তদবিরে সফল হয়ে সেনাবাহিনীর চাকরি ফিরে পান। পরে জিয়া-খালেদার মন্ত্রী হন। এই দিন বিকাল সাড়ে ৫টায় মোয়াজ্জেম আহমদ চৌধুরী, সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় কৃষক লীগ নেতা রহমত আলী এমপি সাক্ষাৎ করেন। তিনি মোশতাকের 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' কর্মসূচির কর্ণধার ছিলেন। সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে মস্কোতে নিয়োগপ্রাপ্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত শামসুল হক সাক্ষাৎ করেন।

২ আগস্ট শনিবার সকাল পৌনে ১০টায় উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত ইয়াং ফপ দেখা করেন। সাড়ে ১০টায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কফিলুদ্দিন মাহমুদ, সন্ধ্যা ৬টায় সাবেক এমসিএ মোশাররফ হোসেন চৌধুরী এবং সোয়া ৬টায় সিলেটের মোস্তফা শহীদ এমপি সাক্ষাৎ করেন।

১ আগস্ট শুক্রবার দুপুর ১টায় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী নুরুল ইসলাম চৌধুরী এবং দুপুর দেড়টায় পাহাড়ি নেতা মংপ্রু সাইন সাক্ষাৎ করেন।

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের এই সরকারি কর্মসূচির বাইরেও অনেক অনির্ধারিত কর্মসূচি থাকত। নির্ধারিত তালিকার বাইরেও অনেক সাক্ষাৎপ্রার্থী আসত। সাধারণত তিনি কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না। বাসায়ও দর্শনার্থীর ভিড় থেকেই যেত এবং এটা ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরার পর থেকেই।

বঙ্গবন্ধুর দৈনন্দিন কর্মসূচির যে বিবরণী পাওয়া যায়, তাতে একাধারে বঙ্গাব্দ, খ্রিষ্টীয় ও হিজরি সন-তারিখ-মাস উল্লেখ থাকত। থাকত সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সময়ও।

১ থেকে ১৪ আগস্ট সময়কালে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি সাক্ষাৎ করেছেন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী নুরুল ইসলাম চৌধুরী, যিনি মোশতাকের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন এবং দায়িত্ব পালন করেন। আর এই মন্ত্রীর অধীনে সশস্ত্রবাহিনীর বিপথগামী একাংশ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল। হত্যার ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হলে অনেক ঘটনা, ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা– সবই প্রকাশ হতো। কিন্তু সে কাজটি আজও হয়নি। বর্তমান সরকার দেশ, জাতির স্বার্থে হত্যা-ষড়যন্ত্রের ইতিহাস প্রকাশ করতে পারে।

**লেখক: মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক**

**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য পিআইবি'র প্রকাশনা**

**যোগাযোগ**
**প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ**
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
**৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা**